بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ○

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।

الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ ○

২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗ اَخْلَدَهٗ ○

৩. যে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ○

৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

وَمَا اَدْرٰكَ مَاالْحُطَمَةُ ○

৫. আপনি কি জানেন হুতামা কী?

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○

৬. এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি।

الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ ○

৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ○

৮. নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে।

فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ○

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

ব্যাখ্যা

সূরা হুমাযায় মানবসমাজের কতিপয় লোকের দুইটি মারাত্মক নৈতিক দোষ ও তাদের অর্থলিপ্সার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী ছয়টি আয়াতে এসব কাজের মারাত্মক পরিণামের উল্লেখ আছে। প্রথম দোষটি হল গীবত বা পরনিন্দা। গীবত করা হারাম এবং এতে কবীরা গুনাহ হয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে গীবত করাকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার শামিল বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় দোষটি হল, কারও সামনে তার নিন্দা করা। এটিও জঘন্য কাজ। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত করা হয়। সে তখন এর প্রতিরোধ করে এবং এতে ঝগড়াঝাঁটি ও ফেতনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় দোষটি হচ্ছে, অর্থলিপ্সা। অর্থ অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়। অর্থলোভী ব্যক্তি পরের হক আদায় করে না। গরিব-দুঃখীর পাওনা দেয় না। কৃপণতার কারণে সে বারবার অর্থের হিসাব করতে থাকে। আর ধারণা করে এ অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। তার এ ধারণা একেবারেই অমূলক। যে-সকল লোকের মধ্যে এ দোষগুলো থাকবে আখিরাতে তাদের পরিণাম হবে করুণ। তাদেরকে ‘হুতামা’ নামক অতি গভীর জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা চূর্ণবিচূর্ণ হবে, কঠিন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে। এ শাস্তি শেষ হবে না। কাজেই আমরা গীবত (পরনিন্দা) ও কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকব।

মুনাজাতমূলক তিনটি আয়াত

আল্লাহ আমাদের রব। আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ অসীম। তিনি আমাদের যে-সকল নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহর দয়া ছাড়া আমরা তা সঠিকভাবে পালন করতে পারি না। এজন্যই তাঁর নিকট আমাদের মুনাজাত করতে হয়। আমরা বহু দোষত্রুটি করে থাকি, এ কারণে আমরা অপরাধী এবং শাস্তির যোগ্য। আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি এবং দুনিয়াতে ভালো কাজ করার ক্ষমতা দানের জন্য সদাসর্বদা মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের মুনাজাত করা প্রয়োজন।

নিম্নের মুনাজাতমূলক আয়াতগুলো মুখস্থ করব এবং অর্থ শিখব।

এক

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

(বাকারা : ২০১)

আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিসে আমাদের কল্যাণ এবং কিসে অকল্যাণ, এটা তিনিই ভালো জানেন। এ কারণে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আমরা তাঁরই নিকট মুনাজাত করব। আর জাহান্নামের শাস্তি বড়ই কঠিন। এ শাস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য তাঁরই নিকট আমরা প্রার্থনা জানাব।

দুই

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ○

অর্থ : হে প্রতিপালক! তুমি তাঁদের প্রতি তেমনি সদয় হও, যেমনিভাবে তাঁরা (আদর-যত্নে) শৈশবে আমাকে লালনপালন করেছেন। (বনী ইসরাঈল : ২৪)

সূরা বনী ইসরাঈলের এ আয়াতে পিতামাতার জন্য আল্লাহপাকের নিকট মুনাজাত করার জন্য বলা হয়েছে। পিতামাতার জন্য আমরা কী দুআ করব, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদের তা শিখিয়ে দিয়েছেন। আমরা এ আয়াতটি মুখস্থ করে এ আয়াতের দ্বারা পিতামাতার কল্যাণের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করব।

তিন

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ أَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ
يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ○

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (ত্বোহা : ২৫-২৮)

আমরা লেখাপড়া শিখব। জীবনে উন্নতি লাভ করব। মানবকল্যাণে সচেষ্ট হব। যাতে আমরা এ কাজগুলো সহজে করতে পারি এজন্য আমাদের অন্তর প্রসারিত তথা জ্ঞানবুদ্ধিকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করব।

হাদীস শরীফ

হাদীস অর্থ কথা বা বাণী। মহানবী (স)-এর কথা, কাজ এবং মৌনসম্মতিকে হাদীস বলা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ তাআলার রাসূল। তিনি জীবনে যত কথা বলেছেন তা-ই হাদীস। তিনি উম্মাতকে কখনও কোনো কাজ করার আদেশ করেছেন। আবার কখনও কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এসব আদেশ-নিষেধ আল্লাহর হুকুম মতোই হত। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স) নিজে যে কাজ করতেন তা উম্মাতের জন্য আদর্শ।

সাহাবীগণ নবী কারীম (স) এর হাদীস সংরক্ষণ করতেন। তাঁরা কথা শুনার জন্য তাঁর পাশে থাকতেন। তিনি মজলিস থেকে উঠে চলে গেলে সাহাবীগণ পরস্পর তাঁর হাদীস আলোচনা করতেন এবং তা কণ্ঠস্থ করতেন। তখন হাদীস লেখা নিষেধ ছিল। কারণ তখন কুরআন নাযিল হচ্ছিল। আর হাদীস লিখলে তা কুরআনের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস নিজেদের স্মৃতিপটে অঙ্কন করে রাখতেন এবং তা অন্যের নিকট পৌঁছে দিতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ নিজেদের শিশুসন্তানদের যেমন কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রে কুরআন শিক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠাতেন, অনুরূপভাবে হাদীস শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁরা নিজেদের ছেলেমেয়েদের হাদীস শিক্ষার জন্য প্রেরণ করতেন।

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) তাঁর বাল্যকালের হাদীস মুখস্থ করার বর্ণনা দিয়ে বলেন, "রাসূল (স)-এর যামানায় আমি বালক ছিলাম এবং তখন আমি রাসূল (স)–এর হাদীস মুখস্থ করতাম।" (মুসলিম শরীফ)

পরবর্তী যুগেও বাল্যকালে হাদীস মুখস্থ করার এ রীতি চালু ছিল। কাজেই আমরাও হাদীস মুখস্থ করার চেষ্টা করব।

কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান

ইসলামে পবিত্র কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। হাদীস ব্যতীত ইসলামী জীবনব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে কুরআনের ব্যাখ্যা দানের নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই হাদীস। সালাত কীভাবে পড়তে হবে, এ বর্ণনা আমরা হাদীসে পাই। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমরা আমাকে যে নিয়মে সালাত পড়তে দেখো সে নিয়মেই সালাত আদায় কর।" ইমাম আবু হানীফা (র) এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, "সুন্নাত বা হাদীস না থাকলে আমরা কেউই কুরআন বুঝতে পারতাম না।" আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর হাদীসের জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। যে ব্যক্তি রাসূল (স)-এর হাদীস শুনে সংরক্ষণ করবে এবং অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধন্য করবেন।

আমরা মহানবী (স)-এর হাদীস আগ্রহের সাথে পাঠ করব এবং তা বুঝতে চেষ্টা করব।

নীতিমূলক হাদীস

জীবন ও সমাজকে সুন্দর করার জন্য উত্তম নীতির অনুসরণ অপরিহার্য। আদর্শ নীতি ও চরিত্রের অনুকরণ ছাড়া ব্যক্তি ও জাতির কখনও উন্নতি হতে পারে না। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন মহান চরিত্রের অধিকারী। আদর্শ নীতির জন্য তিনি শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। আমরা যাতে উত্তম নীতির অধিকারী হতে পারি এ সম্পর্কে তাঁর অনেক হাদীস আছে। নিচে দুইটি নীতিমূলক হাদীস উল্লেখ করা হল–

এক

لَآدِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَلَهٗ (مسند ديلمى) –

অর্থ : "যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়" (মুসনাদ–ই–দায়লামী)।

শিক্ষা

অঙ্গীকার পূর্ণ করা অত্যাবশ্যক। সৃষ্টির সূচনাকালে সকল মানুষ আল্লাহ তাআলাকে রব মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেছে। এ অঙ্গীকার অনুসারে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া আমাদের কর্তব্য। কেয়ামতের দিন এ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। দুনিয়াতে যেসব ওয়াদা করা হয় সেগুলোও পালন করতে হবে।পরস্পরের লেনদেন কথা কাজ ইত্যাদি ব্যাপারেও যে অঙ্গীকার করা হয় তাও আমাদের পূরণ করতে হবে। সমাজে এ নীতি প্রতিপালিত হলে সমাজের অশান্তি অনেকাংশে দূর হয়ে যাবে। আমরা সর্বদা অঙ্গীকার রক্ষা করব।

দুই

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ –

অর্থ : "পাক পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" (মুসলিম)

শিক্ষা

পবিত্রতার কয়েকটি স্তর আছে। যথা–শরীরকে নাপাক থেকে পবিত্র করা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সকলপ্রকার পাপ কাজ থেকে পবিত্র রাখা। কুচিন্তা থেকে অন্তর পবিত্র রাখা। ঈমান মানুষকে ছোট বড় পাপ থেকে পবিত্র রাখে। ওযূ, গোসল এবং বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা মানুষের শরীরকে পবিত্র করে। শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, বিদ্যালয় ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন থাকলে মানুষের অন্তরও প্রফুল্ল থাকে।

আমরা সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকব এবং আমাদের পরিবেশকেও পরিষ্কার রাখব।

মুনাজাতমূলক হাদীস

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন অতি দয়ালু। উম্মতের কষ্টে তিনি মনে ব্যথা পেতেন, অন্তরে দুঃখ অনুভব করতেন। দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি আমাদের মুনাজাতমূলক অনেক হাদীস শিখিয়েছেন যাতে আমরা ঐ হাদীসগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করি। আমরা প্রিয় নবীর মুনাজাতমূলক দুইটি হাদীসের অর্থ শিখব, মুখস্থ করব এবং মুনাজাতে তা ব্যবহার করব।

এক

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ –

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও।" (তাবরানী)

দুই

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا حَلَالًا –

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী বিদ্যা এবং হালাল রিযিক চাই।"

আমরা হাদীসের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব। নীতিমূলক ও মুনাজাতমূলক হাদীসগুলো শুদ্ধভাবে পড়তে পারব। এগুলো অর্থসহ মুখস্থ বলতে পারব এবং মুনাজাতে ব্যবহার করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পবিত্র কুরআনের কোন সূরার আয়াত প্রথম নাযিল হয়?
ক. সূরা আল-ফাতিহা খ. সূরা নাস
গ. সূরা ফালাক ঘ. সূরা আলাক

২। কণ্ঠনালীর শেষ অংশ থেকে কোন কোন হরফ উচ্চারিত হয়?
ক. ه ، ء খ. ج ، ش
গ. ع ، ح ঘ. ا ، ق

৩। ইসলামে মর্যাদার দিক থেকে পবিত্র কুরআনের পরেই কোনটির অবস্থান?
ক. হাদীস খ. ইজমা
গ. কিয়াস ঘ. মুসতাহসান

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সফিকুল ইসলাম দিনমজুরি করে খুব কষ্টের মধ্যে সংসার চালায়। সে অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে।

৪। সফিকুল ইসলাম কাজের পাশাপাশি-
ক. আত্মীয়স্বজনের নিকট টাকা চাইবে খ. হালাল রিযিকের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করবে
গ. সরকারের কাছে সাহায্য চাইবে ঘ. অর্থপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করবে

৫। সফিকুল ইসলাম-
ক. নিজের ভাষায় মুনাজাত করবে খ. কুরআন ও হাদীসের ভাষা ব্যবহার করে মুনাজাত করবে
গ. কেবল কাজই করে যাবে ঘ. যারা ভালো বুঝে তাদের পরামর্শ নিবে

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মুনীর শৈশবে একজন ভালো কারীর নিকট থেকে শুদ্ধভাবে মাখরাজসহ তিলাওয়াত শিখেছে এবং তার বড়ভাই একজন বড় আলেমের কাছে অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ কুরআন শিখছে।

৬। শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত বলতে বুঝায়—
i. মাখরাজসহ
ii. তাজবিদের নিয়মসহ
iii. অর্থসহ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

৭। অর্থসহ কুরআন পড়লে—
ক. জ্ঞানলাভ হয়
খ. ইমামতি করা যায়
গ. অর্থ উপার্জন করা যায়
ঘ. সহীহ্ কুরআন শেখা যায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শিক্ষক আবু সুফিয়ান সাহেব ক্লাসে সূরা আন্ নাস-এর শানে নুযূল ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার্থী উম্মে মারিয়া প্রশ্ন করে, "রাতের অন্ধকারে আমার খুবই ভয় হয়। এতে কী করা উচিত?" আরিফা বলে, "শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় এবং আমাদের মুসলিম সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বিপদে-আপদে সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে দৌড়ায়, তা কি ঠিক?" জবাবে শিক্ষক সূরা আন্ নাস-এর শিক্ষা তুলে ধরেন এবং বলেন, "আমাদের সবকিছুতেই আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। মনে রেখো শয়তান মানুষের চরম শত্রু"।

ক. কুরআন মাজীদের সর্বশেষ সূরা কোনটি ?
খ. জিন শয়তান ও মানুষ শয়তান বলতে কী বুঝ ?
গ. বিপদ-আপদ এবং ভয়-ভীতি থেকে রক্ষা পেতে উম্মে মারিয়া এ সূরা থেকে কী শিক্ষা নিতে পারে ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. শয়তান মানুষের চরম শত্রু– কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২। আবদুস সালাম ও আবদুর রহিম দুই বন্ধু। তারা একই সঙ্গে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য ওয়াদা বদ্ধ হয়েছে। কিন্তু একদিন আবদুস সালাম তার খালাত ভাই এর-সাথে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তার বন্ধুকে না-জানিয়ে স্কুলে চলে যায়। স্কুলে আবদুস সালামের সাথে আবদুর রহিমের দেখা হলে আবদুর রহিম অভিযোগ করে বলে তুমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করোনি। অথচ হাদীসে আছে– যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়।

ক. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কী ?
খ. প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বলতে কী বুঝ ? ব্যাখ্যা কর।
গ. আবদুস সালাম প্রতিশ্রুতি রক্ষা না-করার বিষয়টি হাদীসের আলোকে কিরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, সে পরিপূর্ণ দীনদার নয়। হাদীসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৩। সূরা আল-আসর-এর অনুবাদ হল— সময়ের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। পরস্পরকে সৎ কাজের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। কিন্তু দেখা যায়, আবুল হাসনাত কখনও কারও ক্ষতি করে না। এমনকি অন্যায়ের প্রতিবাদও করে না। কাউকে কোনো সৎপরার্মশ পর্যন্ত দেয় না।

ক. 'আসর' অর্থ কী ?
খ. মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?
গ. সূরা আসরের আলোকে হাসনাতের সামাজিক দায়িত্ব পালন হয়েছে কি না ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সৎ কর্ম ও ধৈর্য ধারণ সমাজে কীভাবে শান্তি আনতে পারে আলোচনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক (أَخْلَاقٌ)

পরিচয়

আখলাক হচ্ছে খুলুকুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার। স্বভাব বা চরিত্রকে আখলাক বলে। মানুষ সামাজিক জীব, তাই একজনকে অন্যজনের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতে হয়। মাতা-পিতা, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য লোকদের সঙ্গে লেনদেন, আচার-ব্যবহার করতে হয়। আর এ আচার আচরণ কখনও হয় প্রশংসনীয়, আবার কখনও নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় আচরণকে সচ্চরিত্র বা আখলাকে হামীদাহ্ আর নিন্দনীয় আচরণকে আখলাকে যামীমা বলে।

আখলাকে হামীদাহ্ হল তাকওয়া অর্জন করা, সত্যকথা বলা, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি। আর আখলাকে যামীমা হল মিথ্যাকথা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, পরনিন্দা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, গালি দেওয়া ইত্যাদি। আখলাকে হামীদাহ্ অর্জন করা এবং আখলাকে যামীমা বর্জন করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্যকর্তব্য।

এ অধ্যায় পড়ে আমরা আখলাকের তাৎপর্য বলতে পারব। আখলাকে হামীদাহ্ ও যামীমার পাঁথক্য বলতে পারব। আখলাকে যামীমা বর্জন করব। আখলাকে হামীদাহ্ অর্জন করব।

আখলাকে হামীদাহ্ (أَخْلَاقٌ حَمِيْدَةٌ)

আখলাকে হামীদার তাৎপর্য

মানুষের জীবনে আখলাকে হামীদাহ্ বা প্রশংসনীয় আচরণের তাৎপর্য অনেক। প্রশংসনীয় আচরণ মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে ও সৌহার্দ্য বজায় রাখে। এটা আমাদের জীবনকে মধুময় করে তোলে। এতে আমাদের পারস্পরিক লেনদেনও সহজতর হয়। মহানবী (স) সচ্চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন, "কিয়ামতের দিন মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে উত্তম চরিত্র" (তিরমিযী)। " তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় যার চরিত্র উত্তম।" (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য নিআমত দান করেছেন। এসবের মধ্যে সচ্চরিত্র একটি উত্তম নিআমত। উত্তম চরিত্র শিক্ষার জন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণভাবে সর্বপ্রকার সৎ গুণাবলির প্রতীক।

আল্লাহ তাআলা বলেন– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ○

অর্থ : "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব : ২১)

এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) নিজেও বলেন–

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ـــ

অর্থ : "উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি"।

মহানবী (স)-এর সমগ্র জীবনই আমাদের জন্য আদর্শ। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

তাকওয়া (اَلتَّقْوٰى)

তাকওয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ হল: ভয় করা, বিরত থাকা, পরহেযগারী, আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহ ভীতি। আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রেখে ইসলামের নির্দেশমতো জীবনযাপন করাকে তাকওয়া বলে। তাকওয়া অর্জনকারীকে মুত্তাকী বলে।

তাৎপর্য

তাকওয়ার তাৎপর্য অপরিসীম। তাকওয়া-বিহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কোনো মূল্য নেই। যেমন কুরবানী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, কিন্তু পৌছে তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা হাজ্জ : ৩৭)

তাকওয়া মানবচরিত্রের একটি মহৎ গুণ। এর কারণে একজন মুসলমান যাবতীয় লোভ-লালসা, উত্তেজনা পরিহার করে চলে। আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে। কথায় ও কাজে কাউকে কষ্ট দেয় না। অন্যায়ভাবে কারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করে না। মালে ভেজাল ও মাপে কম দেয় না, প্রতারণা করে না, মিথ্যাকথা বলে না, পরনিন্দা করে না। মুত্তাকী ব্যক্তিকে সকলে ভালো জানে, শ্রদ্ধা করে। বিপদে-আপদে তাকে সহায্য করে।

মানুষের ইহকাল ও পরকালের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ। তাকওয়ার দ্বারা এ নিআমত লাভ করা যায়। আল্লাহ পাক বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۝

অর্থ : "আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।" (সূরা তাওবা : ৪)

যাবতীয় কাজকর্মে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন"। (সূরা বাকারা : ১৯৪)

আল্লাহর নিকট মান-সম্মানের মাপকাঠি তাকওয়া। ধন–দৌলত, টাকা–পয়সা নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۝

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

> আমরা তাকওয়ার তাৎপর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব। আমরা আল্লাহকে ভয় করব। নিজেদের সবরকম পাপকাজ থেকে বিরত রাখব। খাঁটি মু'মিন হিসেবে জীবনযাপন করব।

তাওয়াক্কুল (اَلتَّوَكُّلُ)

পরিচয়

আল্লাহর ওপর ভরসা করা, নির্ভর করার নামই তাওয়াক্কুল। আল্লাহর ওপর যে নির্ভর করে ও ভরসা করে তাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুলকারী।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদানকারী। আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। কাজেই আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন– وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

অর্থ : "তোমরা একমাত্র আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল কর। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।" (সূরা মায়িদা : ২৩)

তাওয়াক্কুল একটি মহৎ গুণ। এতে মনে সাহস ও শক্তি বাড়ে এবং হতাশা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। নিজকর্মে আগ্রহ বাড়ে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার সার্বিক কার্যাবলির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন– "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।" (সূরা ত্বালাক : ৩)

মহানবী (স) বলেছেন, "যদি তোমরা চেষ্টা করতে ও আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা রাখতে তবে আল্লাহ তোমাদের পশুপাখির ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশুপাখি সকালবেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে।" (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

আমরা কাজকর্ম করব। চেষ্টা সাধনা করব। প্রয়োজনীয় উপায়, উপকরণ ও কৌশল অবলম্বন করব। আর সফলতার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করব।

সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)

মানুষের সবচেয়ে ভালো গুণ হল সত্যবাদিতা বা সত্যকথা বলা। যে সত্যকথা বলে তাকে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে ও সম্মান করে। সত্যবাদী ব্যক্তি দুনিয়াতে যেমন মান-সম্মানের অধিকারী হন তেমনি আখিরাতেও তাঁর জন্য রয়েছে অনন্ত সুখশান্তি। সত্যবাদী ব্যক্তির মনোবল থাকে। তিনি সত্যকথা বলতে কাউকে ভয় করেন না। যে সত্য বলে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, ভালোবাসে না, সম্মান করে না। তার মনোবল থাকে না।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ছোটকাল থেকেই সত্যবাদী ছিলেন। তিনি জীবনে মিথ্যাকথা বলেননি। জাহিলী যুগের আরবরা তাঁর এ সত্যবাদিতার কারণে তাঁকে খুব ভালোবাসত। তিনি সবার কাছে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী বলে সুপরিচিত ছিলেন। সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে– اَلصِّدْقُ يُنْجِىْ –

অর্থাৎ সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি দেয়। মহানবী (স) বলেন, "তোমাদের উচিত সত্যবাদী হওয়া। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য বেহেশতের পথে পরিচালিত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সত্যবাদিতা সম্পর্কে বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আছে। তিনি তখন অল্পবয়স্ক বালক। শিক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি বাগদাদ গমনের সময় তাঁর মা তাঁকে সর্বদা সত্যকথা বলার উপদেশ দেন। যাত্রাপথে এক জায়গায় কাফেলা রাত্রিযাপনের জন্য তাঁবু খাটালে তাতে ডাকাত ঢুকে পড়ল। ডাকাতরা মালামাল লুটপাট করার জন্য প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করল, কার কাছে কী আছে। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-কে ডাকাতরা যখন জিজ্ঞেস করল, তখন তিনি ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে বলে জানালেন।

ডাকাতদের বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, 'স্বর্ণমুদ্রা কোথায়? আমাদের তা দেখাও।' তিনি জামার মধ্যে সেলাই-করা অবস্থায় ডাকাতদের তা বের করে দেখালেন। ডাকাতরা অবাক হয়ে বলল, 'এরূপ লুকানো মুদ্রা আমরা খুঁজে পেতাম না, তুমি বললে কেন?' তিনি বললেন, 'আপনারা জিজ্ঞেস করায় আমি সত্যকথা বলে দিয়েছি। কারণ আমার মা সর্বদা আমাকে সত্যকথা বলতে উপদেশ দিয়েছেন।' ডাকাতরা এতে নিজেদের পাপকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা করল এবং সৎপথে চলার প্রতিজ্ঞা করল। তারা ডাকাতি ছেড়ে দিল। এভাবেই সত্যবাদিতা মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়।

আমরা সত্যবাদিতার তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সবসময় সচেতন থাকব, সদাসর্বদা সত্যকথা বলব এবং সত্যবাদী হব।

ওয়াদা পালন

ওয়াদা পালন করা মানে কথা দিয়ে কথা রাখা। কথামতো কাজ করা, চুক্তি রক্ষা করা।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন– يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ○

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা ওয়াদা পূরণ কর।" (সূরা মায়িদা : ১)

কিয়ামতের দিন ওয়াদা ও চুক্তি পালন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে আল্লাহ মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ বলেন, "তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৫)

মহানবী (স) বলেছেন,"ওয়াদা একধরনের ঋণ।" অর্থাৎ কারও নিকট থেকে ঋণ নিলে যেমন পরিশোধ করতে হয় তেমনি কারও সাথে ওয়াদা করলে তা পূরণ করতে হয়।

উপকারিতা

ওয়াদা পালনকারী সমাজে সম্মানের পাত্র। সকলে তাকে বিশ্বাস করে ও ভালো জানে। তার সাথে লেনদেন করতে আগ্রহী হয়। অভাব-অনটনে পড়লে তাকে সাহায্য করে। ফলে তার জীবন হয় সুনামের ও সুখময়, দুশ্চিন্তামুক্ত।

ওয়াদা ভঙ্গের কুফল

ওয়াদা ভঙ্গ করা একটি মারাত্মক অপরাধ। ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য এ দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা ও অপমান। আর পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি। যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তার সাথে কেউ লেনদেন করতে চায় না। দুর্দিনে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। ফলে তার জীবন একেবারে দুঃখময় হয়ে পড়ে।

আমরা সতর্কতার সাথে ওয়াদা পালন করব। কথা দিয়ে কথা রাখব। সকলেই আমাদের ভালো জানবে। আমরা সুখী হব।

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

আমাদের জীবনে পিতামাতার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁরা আমাদের জন্য সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করেন। শিশুবয়স থেকেই তাঁরা কতই না আদর-স্নেহে আমাদের লালনপালন করে আসছেন, আমাদের সুখশান্তির জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আমাদের অসুখ-বিসুখে তাঁদের দুশ্চিন্তার কোনো সীমা থাকে না। গভীর মায়া-মমতায় তাঁরা আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থা করে থাকেন। পৃথিবীতে পিতামাতার চেয়ে আপনজন আর কেউ নেই।

কর্তব্য

পিতামাতার প্রতি অনুগত থাকা, তাঁদের সকল আদেশ–নিষেধ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। সেই সাথে তাঁদের সেবা-যত্ন করাও আমাদের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন– وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ○

অর্থ : "পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাঁদের সেবা-যত্ন করতে হবে। এমনকি তাঁরা মনে কষ্ট পান এমন কোনো কথাই তাঁদের সামনে বলা যাবে না। অত্যন্ত নম্রতার সাথে মার্জিত ভাষায় তাঁদের সাথে কথা বলতে হবে। তাঁদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। আর পিতামাতা ইন্তিকাল করলে তাঁদের জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট দুআ করতে হবে এই বলে– رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

অর্থ : "হে প্রতিপালক! তুমি তাঁদের প্রতি তেমনি সদয় হও, যেমনিভাবে তাঁরা (আদর-যত্নে) শৈশবে আমাকে লালনপালন করেছেন"। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

খিদমতের সুফল

মহানবী (স) বলেছেন: اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ ○ অর্থ: "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"

মহানবী (স) আরও বলেন, "পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি; পিতার অসন্তুটিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"

পিতামাতার কথা মেনে চললে যেমন দুনিয়ায় সফলতা লাভ করা যায় তেমনি পরকালেও বেহেশত লাভ করা যায়।

আমরা পিতামাতার সকল আদেশ মেনে চলব, তাঁদের সেবা-যত্ন করতে ত্রুটি করব না, কোনো কথা বা কাজ দ্বারা কষ্ট দিব না। তাঁদের সুখশান্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য

পরিচয়

আত্মীয়রা আপনজন। আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক যার সেই আত্মীয়। আত্মীয়স্বজন বলতে ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফা-ফুফী, খালা-খালু, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং অন্যান্য নিকটস্থ বন্ধু-বান্ধবকে বুঝায়।

কর্তব্য

পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের পর আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমাদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। এদের মধ্যে যারা ছোট তাদের আদর-স্নেহ করতে হবে এবং যাঁরা বড় তাদের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে হবে। আবার এদের মধ্যে যাঁরা সচ্ছল তাঁদের সাথে যেমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে হবে, তেমনিভাবে যাঁরা দরিদ্র ও অভাবী তাঁদের যথাসাধ্য ধন-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে হবে। রোগাক্রান্ত হলে সেবা-যত্ন করতে হবে এবং বিপদাপদে তাঁদের খোঁজখবর নিতে হবে।

আত্মীয়স্বজনদের কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া বা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা ভীষণ অন্যায় কাজ। তবে অন্যায়মূলক বা কোনোপ্রকার পাপকর্মে আত্মীয়স্বজনকে সহযোগিতা করা সমীচীন নয় বরং সেক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর সেটাই হবে তাঁদের প্রতি সত্যিকারের দায়িত্ব পালন।

আল্লাহ তাআলা পিতামাতার পর আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন—

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى ○

অর্থ : "পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।" (সূরা নিসা : ৩৬)

আত্মীয়স্বজনের প্রাপ্য অংশ বা হক আদায় করে দিতে হয়। এতে কোনোরূপ কুটিলতার আশ্রয় নেওয়া মহা-অন্যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ হল–

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ ○

অর্থ : "তুমি আত্মীয়স্বজনের হক দিয়ে দাও।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৬)

মহানবী (স) বলেছেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"

আমরা সকলে আত্মীস্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করব ও তাঁদের প্রাপ্য দিয়ে দেব। তাঁদের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য করব। প্রতিটি ভালো কাজে সহযোগিতা করব।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

পরিচয়

আমরা সামাজিক জীব। পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন ছাড়াও আমাদের পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে অনেক লোক আছে যাঁদের সাথে আমরা মিলেমিশে বসবাস করি। এরা সকলেই আমাদের প্রতিবেশী। মহানবী (স) বলেছেন, "আশেপাশের চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে।"

কর্তব্য

প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা, অসুখে-বিসুখে তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়া, তাঁদের মঙ্গল কামনা করা, দোষত্রুটি খুঁজে না বেড়ানো একজন সৎ প্রতিবেশীর অবশ্য কর্তব্য। প্রতিবেশীর সাথে কোনোরূপ দুর্ব্যবহার বা তাঁদের ওপর জুলুম অত্যাচার করা অন্যায় কাজ। মহান আল্লাহ এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবী (স) বলেছেন– "যার প্রতিবেশী অনাহারে রাত্রি যাপন করে সে প্রকৃত মুমিন নয়"।

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাঁদের অধিকার রক্ষার বিষয়ে মহানবী (স) সর্বদা তাঁর অনুসারীদের তাকিদ দিতেন। মহানবী (স) বলেছেন– لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ —

অর্থ : "সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যার প্রতিবেশীরা তার অন্যায় অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়।" (মুসলিম)

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ করা মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। তিনিই আদর্শ মানুষ, যে বড়দের শ্রদ্ধা এবং ছোটদের স্নেহ করে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) বয়সে বড়দের সম্মান করতেন আর যারা তাঁর ছোট ছিল তাদের আদর করতেন। ছোটদের নানারূপ আবদারে তিনি কখনোই বিরক্ত বোধ করতেন না।

বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার গুরুত্ব অনেক। এতে ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করতে শিখে এবং বড়রা ছোটদের প্রাণভরে স্নেহ করে, ভালোবাসে। ফলে সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মহানবী (স) বলেছেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا ○

অর্থ : "ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় যে ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না।" (তিরমিযী)

বড়দের সাথে সাক্ষাৎ হলে ছোটদের সালাম দিতে হয়, সৌজন্য বজায় রেখে কথাবার্তা বলতে হয়। প্রয়োজনে তাঁদের কাজকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়। তাঁরা শিক্ষামূলক যে সকল কথা বলেন তা শুনে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তাঁরা যে কাজ করার আদেশ দেন তা খুশিমনে পালন করতে হয়।

অনুরূপভাবে বড়দের কর্তব্য হচ্ছে, ছোটদের আদর-সোহাগ করা, তাদের সুন্দর আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া। আদর করলে শিশুরা আনন্দমনে আগ্রহের সঙ্গে উপদেশ গ্রহণ করে। এতে তাদের মনের প্রসারতা বাড়ে।

মহানবী (স) বলেছেন,"বার্ধক্যের কারণে যদি কোনো বৃদ্ধকে কোনো যুবক শ্রদ্ধা করে তাহলে আল্লাহ তাআলাও ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।" (তিরমিযী)

অতএব, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। অন্যদিকে ছোটদের স্নেহ করা ও তাদের আদর-সোহাগ করাও বড়দের একান্ত উচিত।

আমরা বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করব।

সহপাঠীদের সাথে সদ্ব্যবহার

আমাদেরকে সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে মিশতে হয়। স্কুলে যাদের সাথে আমরা একই শ্রেণীতে লেখাপড়া করি তারা আমাদের সহপাঠী। সহপাঠীরা আমাদের প্রিয়জন। তাদের সাথে আমাদের এক আন্তরিক ও মধুর সম্পর্ক রয়েছে। স্কুলে থাকাকালীন আমরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি। কেউ অসুস্থ হলে তার সেবা করি, প্রয়োজনে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। কারও কাগজ, কলম, পেনসিল ইত্যাদি না থাকলে তাকে তা দিয়ে সাহায্য করি। কেউ কোনো কারণে বিষণ্ন বা চিন্তিত হলে তার বিষণ্নভাব দূর করতে চেষ্টা করি। কারও কোনো দুঃসংবাদ আসলে তাকে আমরা সান্ত্বনা দিই, ধৈর্যধারণ করতে বলি। কারও কোনো সুখবর পেলে আমরা তার আনন্দে শরীক হই।

সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে স্কুলে এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রতি খুশি হন। সহপাঠীদের সাথে আমরা সবসময় ভালো ব্যবহার করব, সকলে মিলেমিশে থাকব। কারও সাথে ঝগড়া করব না। কাউকে হিংসা করব না। এতে আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন।

আখলাকে যামীমা (اَخْلَاقٌ ذَمِيْمَةٌ)

পরিচয়

আমরা আগেই জেনেছি নিন্দনীয় আচরণই হল আখলাকে যামীমা। মিথ্যাচার, মানুষের ওপর অত্যাচার, আত্মীয়স্বজনের অধিকার নষ্ট করা, গালি দেওয়া, ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ইত্যাদি কাজ আখলাকে যামীমা বা নিন্দনীয় আচরণ। নিন্দনীয় আচরণ মানুষকে অপমান ও নিন্দার পাত্রে পরিণত করে। কাউকে উপহাস-বিদ্রুপ করা, কারও দোষারোপ করা, মন্দ নামে ডাকা, অমূলক ধারণা করা, নিন্দা করা ইত্যাদি নিন্দনীয় আচরণ। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। নবী কারীম (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তির স্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (স) যাবতীয় নিন্দনীয় আচরণ থেকে পূত-পবিত্র ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলেননি, কাউকে গালি দেননি, কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননি, কারও সঙ্গে প্রতারণা করেননি। আমরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করব। কখনও মিথ্যাকথা বলব না, ওয়াদা ভঙ্গ করব না, কারও সাথে প্রতারণা করব না এবং কারও গীবত করব না।

মিথ্যাচার (اَلْكِذْبُ)

প্রকৃত ঘটনা বা অবস্থাকে বিকৃত করে পরিবেশন করাকে মিথ্যাচার বলে। যে মিথ্যা কথা বলে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়।

মিথ্যাচার একটি নিন্দনীয় আচরণ এবং অত্যন্ত খারাপ কাজ। মিথ্যাকথা বলা মুনাফিকের পরিচয়। মিথ্যাচার মানুষের মানসম্মান নষ্ট করে। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না, বিশ্বাস করে না এবং তার কথার কোনো গুরুত্বও দেয় না। মহনাবী (স) বলেছেন, "তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাকো, কারণ মিথ্যাচার অন্যায়কর্মের দিকে ধাবিত করে, আর অন্যায় দোযখের পথে ধাবিত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সকল পাপের মূল হল মিথ্যাচার। মিথ্যা পরিত্যাগ করতে পারলে সকলপ্রকার পাপ থেকেই বাঁচা যায়। মিথ্যাবাদীকে মানুষ পছন্দ তো করেই না, এমনকি ফেরেশতারাও মিথ্যাবাদী থেকে দূরে চলে যান। মহানবী (স) বলেছেন, "বান্দা যখন মিথ্যাকথা বলে, ফেরেশতারা তখন এর দুর্গন্ধের কারণে দূরে চলে যান।" (তিরমিযী)

মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে এবং এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

কথিত আছে– একটি রাখাল বালক মাঠে গিয়ে খেলার সময় চিৎকার করে বলত, "বাঘ, বাঘ, বাঁচাও, বাঁচাও!" লোকেরা তাকে বাঁচানোর জন্য নিকটে গেলে সে বলত বাঘ চলে গেছে। এভাবে কয়েকদিন খেলা করার পর একদিন

সত্যি সত্যিই বাঘ এল, কিন্তু সেদিন চিৎকার করার পরও কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে এল না। কারণ এতদিন সে মিথ্যা বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। বাঘ ছেলেটিকে খেয়ে ফেলল। এভাবেই মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলব না।

গীবত বা পরনিন্দা (اَلْغِيْبَةُ)

গীবত বলতে বুঝায় কারও অগোচরে তার এমন দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশ করা যা শুনতে পেলে সে মনে কষ্ট পায়। গীবত একটি অতি জঘন্য গুণাহের কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য।

একবার নবী কারীম (স) সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে?" তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন, "যা তোমার ভাই অপছন্দ করে, তা তার অসাক্ষাতে আলোচনা করলে গীবত হয়।" (মুসলিম)

গীবত একটি নিন্দনীয় কাজ। এর দ্বারা মানুষের সম্মান ও মর্যাদা খাটো হয়। মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর কারণে সমাজে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও নানারকম অশান্তি সৃষ্টি হয়। গীবত করাকে আল্লাহ তাআলা মৃতভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা একে অপরের গীবত কোরো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে ? নিশ্চয় তা তোমরা অপছন্দ করবে।" (সূরা হুজুরাত : ১২)

প্রত্যেক মুসলমানের ধন, প্রাণ ও সম্মান অন্য মুসলমানের কাছে পবিত্র। গীবত অন্য মুসলমানের সম্মান নষ্ট করে। এ কারণে ইসলামে গীবত হারাম। গীবত শ্রবণ করাও অনুচিত।

আমরা কারও গীবত করব না। কারও গীবত শুনবও না। গীবতকারীকে ঘৃণার চোখে দেখব। এতে সমাজে শান্তি আসবে।

গালি দেওয়া (اَلسَّبُّ)

গালি অর্থ কাউকে মন্দ বলা ও তিরস্কার করা। গালি দেওয়া একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। মুসলমানরা কাউকে গালি দেয় না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে গেলে পরস্পরে মতপার্থক্য, ভুল-বুঝাবুঝি হতে পারে। একজনের সাথে অন্যের কথা কাটাকাটিও হতে পারে। তাই বলে একে অন্যকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করা নিতান্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয়, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে, সে নীচ ও ঘৃণিত। তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার সাথে কেউ বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা করতে চায় না। সমাজে তার কোনো মূল্য থাকে না।
মহানবী (স) মুসলমানদের একে অপরকে গালাগালি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ

অর্থ : "মুসলমানদের গালি দেওয়া পাপ এবং হত্যা করা কুফরী।" (বুখারী ও মুসলিম)

গালির জওয়াবে গালাগালি করে প্রতি-উত্তর দেওয়া অনুচিত। মহানবী (স)-এর কাছে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্প্রদায়ের ভিতর আমাকে এক ব্যক্তি গালি দেয় অথচ সে আমার থেকে নীচ। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কী কোনো বাধা আছে?" রাসূল (স) তখন বললেন, "পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরের দোষারোপ করে"। নবী কারীম (স) আরও বলেছেন, "পিতামাতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ।" সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল এমন কোনো নরাধম আছে যে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়?" তিনি বললেন, "যে অপরের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং এভাবে অপরও তার পিতামাতাকে গালি দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যের পিতামাতাকে গালি দেওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া।

আমরা গালির উত্তরে গালি দিব না, এতে গালমন্দকারী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। নিজের ভুল বুঝতে পারবে এবং গালাগালির মতো নিন্দনীয় স্বভাব পরিহার করবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা অবশ্যকর্তব্য। অপরদিকে তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি জঘন্য কাজ। আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সর্ম্পক ছিন্ন না করা আল্লাহরই র্নিদেশ। মহান আল্লাহ বলেন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى ○

অর্থ : "পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার কর।" (সুরা নিসা : ৩৬)

আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত। কেউ তাকে পছন্দ করে না এবং তার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখে না । বিপদে আপদে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। সে সমাজে নিষ্ঠুর ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়। মহানবী (স) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে বলেন–

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ ○

অর্থ : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

মহানবী (স) আরও বলেন, "যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি রয়েছে আল্লাহর রহমত সেখানে অবতীর্ণ হয় না।" আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে অশান্তি নেমে আসে। সম্পর্ক ছিন্নকারী সমাজে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়। তার জন্য রয়েছে পরকালে কঠোর শাস্তি।

আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব, বিপদাপদে আত্মীয়দের খোঁজখবর নেব। এতে আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হবেন। মানুষ আমাদের ভালোবাসবে।

রাহ্যানি

রাহ্যানি মানে ছিনতাই করা, জনপদে অস্ত্রের সাহায্যে কিংবা কোনো হিংস্র উপায়ে কোনো ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করে তার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াকে রাহ্যানি বলে। রাহ্যানি একটি জঘন্য গুনাহের কাজ। এ গুণাহে লিপ্ত ব্যক্তি সমাজের শত্রু। এদের কারণে সাধারণ মানুষ রাস্তা-ঘাটে বা জনপদে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যের মালামাল নিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে ভয় করে। ফলে তারা বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, দেশবাসী কষ্ট পায়।

রাহ্যানি একটি মারাত্মক অপরাধ। এটি আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো জঘন্য কাজ। তাই এর শাস্তিও কঠিন। মহানবী (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাহ্যানিতে লিপ্ত হয়, সে আমার উম্মাত নয়"। (আবু দাউদ)

রাহ্যানির কারণে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। মানুষের অশান্তি ও দুর্ভোগ বাড়ে। আমরা রাহ্যানিকে ঘৃণার চোখে দেখব। রাহ্যানিতে লিপ্ত ব্যক্তি পরিত্যাগ করব। সাধ্যমতো প্রতিরোধ করব।

ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল

মানুষ আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে যা মানুষের কল্যাণকর তা হালাল বা বৈধ করেছেন। আর যা কল্যাণকর নয় তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা ও নবী কারীম (স)-এর সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ অসৎ সঙ্গ ও কুপ্ররোচনার কারণে নানাপ্রকার ক্ষতিকর জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এতে তার নিজের, পরিবারের ও সমাজের অশেষ ক্ষতি হয়। ধূমপান ও মাদকাসক্তি মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর অন্যতম।

ধূমপান

ধূমপান একটি ক্ষতিকর বদঅভ্যাস। এতে অর্থের অপচয় ও শারীরিক ক্ষতি সাধিত হয়। অপব্যয় করা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তাআলা অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলেছেন।
আল্লাহর বাণী–

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ○

অর্থ : “নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই”। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৭)

আল্লাহ আরও বলেছেন, “অপব্যয়কারীকে আল্লাহ ভালোবাসেন না।” ধূমপানে পেট ভরে না, তাতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটে না। এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না। কিন্তু এর জন্য প্রচুর টাকা-পয়সা ব্যয় হয়। অতএব এটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অপব্যয় মেটাতে ধূমপায়ীরা সংসারে অসচ্ছলতা ও আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে। আত্মীয়স্বজনের সাথে অসদ্ব্যবহার করে। এতে পরিবার ও সমাজে নানারকম অশান্তি দেখা দেয়। অন্যদিকে ধূমপানের ফলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। আর এ দুর্গন্ধ মানুষকে কস্ট দেয়। মানুষকে কস্ট দেওয়া পাপের কাজ।

মহানবী (স) বলেছেন, “মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে যেন কেউ মসজিদে না যায়।” মুখে দুর্গন্ধ থাকলে মসজিদে নামাযীরা কস্ট পায়, সভা-সমিতিতে অধূমপায়ীদের খুব কস্ট হয়।

ধূমপান বলতে সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুক্কা ইত্যাদির ধোঁয়া পান বুঝায়। ধূমপানে বিষপান হয়। কারণ এতে থাকে নিকোটিন জাতীয় বিষ, যা ধীরে ধীরে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন– ধূমপানের কারণে মানব শরীরে শ্বাসকস্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, হৃদরোগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হতে পারে এবং এর ফলে মানুষ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে। যে ধূমপান করে শুধু সে-ই যে কেবলমাত্র রোগে আক্রান্ত হয় তা নয়, বরং তার সংস্পর্শে নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক নির্বিশেষে যে-ই আসে সে-ই আক্রান্ত হয়। দুইটি সিগারেটে যে নিকোটিন থাকে তা যদি কোনো সুস্থ মানুষের শরীরে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে সে নির্ঘাত মারা যাবে। সুতরাং আমরা নিজেরা ধূমপান করব না, যারা করে তাদের বিরত রাখতে চেস্টা করব।

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক বদঅভ্যাস। মাদক বলতে ঐ বস্তুকে বুঝায় যা মানুষের দেহ ও মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

মহানবী (স) বলেছেন–

اَلْخَمْرُ مَاخَمَرَ الْعَقْلَ–

অর্থ : "যা জ্ঞান–বুদ্ধি লোপ করে দেয় তা মাদকদ্রব্য।" (বুখারী)

বর্তমানে পরিচিত মাদকদ্রব্য হল—মদ, তাড়ি, হিরোইন, গাঁজা জাতিয় যেমন মারিজুয়ানা, চরস, ভাং। আফিম জাতীয় যেমন মরফিন, পেথিডিন, কোডিন, ফেনসিডিল এবং বিভিন্ন প্রকার ঘুমের ওষুধ। এসব দ্রব্যের কিছু কিছু ওষুধ হিসেবে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হারাম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা, ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র; শয়তানের কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।" (সূরা আলমায়িদাহ : ৯০)

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা নামায, রোযা এবং যাবতীয় ইবাদাতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। মাদকাসক্তি তাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে। এজন্য তাদের পরকালে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

মহানবী (স) বলেছেন, "মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (দারিমী)

মাদকাসক্তিতে যেমন সম্পদের অপচয় হয় তেমনি মাদকাসক্ত ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি, হত্যাসহ নানা প্রকার অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া মাদকাসক্ত ব্যক্তি রুচিহীনতা, অপুষ্টি, লিভার ও কিডনি নষ্ট, শারীরিক শীর্ণতা, ওজন কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্ষতি, কফ, কাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার পারিবারিক বন্ধন কমে যায়। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও জীবনীশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। কোনো কাজে তার মন বসে না।

> আমরা মাদকাসক্তির মতো খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকব। ইসলামে মাদকাসক্তি সম্পর্কে যে বিধি-বিধান আছে তা আমরা মেনে চলব। অসৎ ও মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য থেকে দূরে থাকব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গীবত শব্দের অর্থ হল—

ক. শত্রুতা খ. ছিনতাই

গ. মিথ্যাচার ঘ. পরনিন্দা

২। আল্লাহর নিকট মান-সম্মানের মাপকাঠি—

ক. তাকওয়া খ. তাওয়াক্কুল

গ. সত্যবাদিতা ঘ. ওয়াদাপালন

৩। "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" অনূদিত আয়াতটিতে বুঝানো হয়েছে—

ক. রাসূলের প্রতি ভালোবাসা
খ. রাসূলকে অনুসরণ
গ. রাসূলের জীবনী পাঠ
ঘ. রাসূলকে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করা

৪। সত্যবাদীর মনোবল অটুট থাকে, কারণ—

ক. তিনি সত্য বলতে দ্বিধা করেন না
খ. তিনি জানেন, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী
গ. তাকে সকলে ভালোবাসে
ঘ. তার বন্ধুর অভাব হয় না

৫। করিম ঢাকায় চাকরি করে। তার মা গ্রামে অসুস্থ। তার সেবা করার অন্য কেউ নেই। মায়ের জন্য করিম কী করবে ?

ক. চাকরিস্থল থেকে ছুটি নিয়ে মায়ের সেবা করবে
খ. চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে মায়ের সেবা করবে
গ. ঢাকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেবে
ঘ. মা ও তাঁর ডাক্তারের পরামর্শ মতো কাজ করবে

৬। গীবত একটি ঘৃণিত আচরণ, কারণ—

i. গীবত দুর্নীতির জন্ম দেয়
ii. গীবত করা হারাম
iii. গীবত সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে

নীচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii এবং iii

নিচের তথ্যের আলোকে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাঈমদের গাছের কয়েকটি ডাল তাদের প্রতিবেশীর বাড়ির উপর গিয়ে পড়েছে। এতে প্রতিবেশীর বাড়িতে আলোর সমস্যা হচ্ছে। তাদের অসুবিধা দেখে নাঈম তার পিতাকে বিষয়টি বলল।

৭। নাঈমের কাজটিতে ফুটে উঠেছে—

ক. দায়িত্ববোধ
খ. শৃঙ্খলাবোধ
গ. মানবতাবোধ
ঘ. সংযম

৮। নাঈমের পিতা উক্ত অবস্থায় কী করবেন ?

ক. গাছগুলো কেটে ফেলবেন
খ. বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন
গ. ডালগুলো ছেঁটে দিবেন
ঘ. প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলবেন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আবদুল হক বাজার থেকে দুই কেজি মাছ ক্রয় করে বাড়ি এসে মেপে দেখার পর সে ২০০ গ্রাম মাছ কম পায়। বাজারে ফিরে গিয়ে সে মাছ-বিক্রেতাকে ২০০ গ্রাম মাছ কম দেওয়ার কথা জানালে বিক্রেতা অস্বীকার করে। আবদুল হক বলে, 'এটা মিথ্যাচার ও প্রতারণা। আপনার মধ্যে তাকওয়া থাকলে এমনটা করতে পারতেন না। আখিরাতে কিন্তু এর হিসাব বুঝে দিতে হবে।'

ক. তাকওয়া অর্থ কী ?
খ. তাকওয়া বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ।
গ. মাছ-বিক্রেতার কাজটি কীভাবে তাকওয়া পরিপন্থী হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব বুঝিয়ে লিখ।

২। সাজিদ একদিন স্কুলে যাচ্ছিল। পথে সে শুনতে পেল, গাছ থেকে পড়ে গিয়ে একটি ছেলের হাত-পা ভেঙ্গে গেছে। সে তাড়াতাড়ি হেঁটে গিয়ে দেখতে পেল ছেলেটি তাদের প্রতিবেশী নাহিদ। সে তখন বাড়ি ফিরে গিয়ে নাহিদের মা-বাবাকে খবর দিল এবং নিকটস্থ হাসপাতালে নিতে সাহায্য করল। সাজিদের সেদিন আর স্কুলে যাওয়া হল না। কারণ সাজিদ জানে, আমাদের রাসূল (স) প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন।

ক. হাদীস অনুযায়ী কত ঘর পর্যন্ত লোকদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে ?
খ. প্রতিবেশীর প্রতি একটি কর্তব্য ব্যাখ্যা কর।
গ. অসুস্থ প্রতিবেশী নাহিদের প্রতি সাজিদ যে দায়িত্ব পালন করেছে তা কিরূপ হয়েছে ব্যাখ্যা কর।
ঘ. প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশ–হাদীসের উদাহরণসহ কথাটি বুঝিয়ে লিখ।

৩। শাহীন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সঙ্গদোষে সে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে নেশার অর্থ যোগাতে তার মা-বাবার নিকট এটা-ওটা কেনার কথা বলে টাকা-পয়সা নেয়। এছাড়া গাড়িতে বা জনসমাবেশে বাবা মারা গেছে, মা অসুস্থ ইত্যাদি বলে নেশার টাকা যোগাড় করে। এভাবে শাহীন ধীরে ধীরে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায় এবং বাবা-মায়ের অনেক অর্থসম্পদ নষ্ট করে।

ক. মাদক কী ?
খ. শাহীন কেন মিথ্যাচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ? ব্যাখ্যা কর।
গ. মাদকাসক্তি কীভাবে শাহীনের জীবনে ধ্বংস ডেকে এনেছে তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মাদকাসক্তি অনেক মানুষের জীবন ও অর্থ নষ্ট করে দিচ্ছে— কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

হযরত আদম (আ)

মহান আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি প্রেরণের ইচ্ছা করেন। আর ফেরেশতাদের ডেকে বলেন– "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।" তাঁরা বলল, "আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? অথচ আমরাই তো আপনার গুণগান করছি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" তিনি বলেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।" আল্লাহ তাআলা এক মহান উদ্দেশ্যে আদমকে সৃষ্টি করলেন। সে উদ্দেশ্য হল তাঁর ইবাদাত করা ও হুকুম মেনে চলা এবং পৃথিবীতে তাঁর বিধি-বিধান চালু করা। তিনি পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

অর্থ : "আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষ ও সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ)। মহান আল্লাহ মাটি দ্বারা আদম (আ)-এর দেহের একটা আকৃতি বানালেন। এরপর সেই দেহের মধ্যে প্রাণ দান করলেন।

আল্লাহ আদম (আ)-কে সবকিছুর জ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং এ জ্ঞানের কারণেই সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করলেন। এবার আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, "তোমরা আদম (আ)-এর সম্মানে সিজদাহ কর।" সকলে সিজদাহ করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে বলল, "আদম মাটির তৈরি আর আমি আগুনের তৈরি। আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ।" সে অহঙ্কার করল, আল্লাহ অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। তাই ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে শয়তানে পরিণত হল।

আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে বেহেশতে থাকতে দিলেন। সেখানে নানারকম খাবার, ফল-ফলাদি, আরাম-আনন্দের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আদম ছিলেন একা, তাঁর একাকী ভাল লাগল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গী সৃষ্টি করলেন, তাঁর নাম হাওয়া (আ)। এবার আল্লাহ বলেন, "তোমরা বেহেশতে থাকো, যা খুশি পানাহার কর।" আল্লাহ তাঁদের একটি গাছ দেখিয়ে বললেন, "ঐ গাছটির নিকটেও যেও না। এ হুকুম না মানলে তোমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে।"

আদম (আ) -কে সিজদাহ না করার কারণে আল্লাহ ইবলীসকে বেহেশত থেকে বের করে দেন। ইবলীস আদমের এ সুখ শান্তি সহ্য করতে পারল না। তাই সে আদমের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। অনেক ছলচাতুরির দ্বারা আদমকে আল্লাহর নির্দেশ ভুলিয়ে দিল। আদম (আ) ও হাওয়া (আ) নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন ও ফল ভক্ষণ করলেন। এজন্য আল্লাহ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেন।

আদম (আ) ও হাওয়া (আ) নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনেক কান্নাকাটি করলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন এবং পৃথিবীতে সুখশান্তিতে বসবাস করার আদেশ দিলেন। সাথে সাথে বলে দিলেন, পৃথিবীতে তাঁরা যদি আল্লাহর নির্দেশমতো জীবনযাপন করে, তবে মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁদের বেহেশতে বসবাস করতে দেওয়া হবে। এরপর আদম (আ) ও হাওয়া (আ) পৃথিবীতে বসবাস শুরু করলে তাঁদের মাধ্যমে অনেক মানব জন্মলাভ করে। ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ভরে ওঠে মানুষে মানুষ। আমরা সকলেই তাঁদের বংশধর। আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ) এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)।

আদম (আ) ভুল করার পর আল্লাহর কাছে তওবা করেছিলেন। আমরাও যদি কোনো অপরাধ করি তাহলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব, তওবা করব। আমরা তাঁর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে তুলব।

ইবলীস অহঙ্কার করার কারণে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং বেহেশত থেকে বিতারিত হয়েছে। আমরা কখনও অহঙ্কার করব না।

হযরত নূহ (আ)

হযরত নূহ (আ) ছিলেন আল্লাহর একজন নবী। তিনি মানুষকে একনাগাড়ে নয়শত পঞ্চাশ বছর আল্লাহর দীনের দাওয়াত দেন। ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। কিন্তু এ দীর্ঘসময়ে শুধুমাত্র চল্লিশজন পুরুষ ও সমসংখ্যক নারী তাঁর কথায় সায় দিয়ে ঈমান গ্রহণ করলেন। বাকিরা কাফিরই থেকে গেল।

হযরত নূহ (আ) প্রতিদিন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন আর ঈমানের দাওয়াত দিতেন। তারা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, নানারূপ নির্যাতন করত। তবুও সব কষ্ট সহ্য করে তিনি দাওয়াত দিতে থাকেন। দীর্ঘদিন এরূপ চলার পর একসময় তিনি নিরাশ হয়ে আল্লাহর কাছে বললেন, "হে প্রভু! আমার জাতিকে আমি দিনরাত তোমার দিকে আহ্বান জানিয়েছি কিন্তু তারা সাড়া না দিয়ে শুধু দূরে পলায়ন করতেই থাকে।" এরপর হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নিকট কাফিরদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য দুআ করেন।

আল্লাহপাক হযরত নূহ (আ)-কে বলেন, "আমার গযব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি নৌকা তৈরি করে রাখো। তুমি আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। যালিমদের জন্য কোনো সুপারিশ করবে না। কারণ তারা ডুবেই মরবে।" হযরত নূহ (আ) একটি বিশাল নৌকা নির্মাণ করলেন। নৌকা দেখে কাফিররা হযরত নূহ (আ)-কে পূর্বের চেয়ে বেশি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা বলল, "এ মরুভূমিতে কীভাবে নৌকা ভাসবে?" তারা নৌকাটিতে মলমূত্র ত্যাগ করে অপবিত্র করে দিল। কিন্তু তারা জানত না যে, এ নৌকাটি মরুভূমিতেই ভাসবে। মহাপ্লাবনে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলবে।

যখন প্লাবন শুরু হওয়ার সময় এল, আল্লাহ হযরত নূহ (আ)-কে ডেকে বললেন, "মুমিনদের এবং প্রত্যেক প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় উঠিয়ে নাও।" হযরত নূহ (আ) অনুসারীদের বললেন, "নৌকায় আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই নৌকা চলবে ও থামবে। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" নৌকা সবকিছু নিয়ে পাহাড়ের মতো ঢেউয়ের মধ্যেও চলতে লাগল।

চল্লিশদিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হল এবং মাটি থেকেও প্রবল বেগে পানি উঠল। পৃথিবী বানের পানিতে ডুবে গেল। কাফিররা বাঁচার জন্য পর্বতচূড়ায় উঠল। কিন্তু তাও ডুবে গেল, সকল কাফির মারা গেল। শুধুমাত্র হযরত নূহ (আ) এবং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিলেন তারাই বেঁচে থাকলেন। কাফির হওয়ার কারণে হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র কিনআনও এ প্লাবনে ডুবে মারা গেল। এরপর প্লাবন বন্ধ করার জন্য হযরত নূহ (আ) আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। আল্লাহর কুদরাতে প্লাবন থেমে গেল, পানিও নেমে গেল।

হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী নামক পাহাড়ের ওপর থামল। নৌকা থেকে সকলে নেমে এলেন পৃথিবীতে। পৃথিবী আগের মতো আবার সবুজ শ্যামল হয়ে উঠল। হযরত নূহ (আ) এবার পূর্ণ উদ্যম নিয়ে আল্লাহর দীন প্রচার করতে লাগলেন। এর কিছুদিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত আদম (আ) যেমন পৃথিবী আবাদ করেছিলেন, হযরত নূহ (আ)-ও তেমনি পৃথিবী আবাদ করেন। এ কারণেই হযরত নূহ (আ)-কে আদমে সানী বা দ্বিতীয় আদম নামে অবিহিত করা হয়। হযরত নূহ (আ) ছিলেন সত্য ও ন্যায় প্রচারে আপোষহীন। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সত্য প্রচার থেকে এতটুকু থেমে থাকেননি। দীনের স্বার্থে তিনি সবরকম লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করেছেন।

সত্য ও ন্যায় প্রচারে আমাদের জীবনেও দুর্ভোগ ও নির্যাতন নেমে আসতে পারে। আমরা এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য-ধারণ করব এবং আল্লাহর দীনের ওপর অটল থাকব।

হযরত সালিহ (আ)

হাজার হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে সামূদ নামক একটি জাতি বসবাস করত। আল্লাহ তাদের ন্যায়ের পথে ডাকার জন্য একজন নবী পাঠালেন। তাঁর নাম হযরত সালিহ (আ) । তিনি মানুষদেরকে এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে আহ্বান জানালেন। আল্লাহ বলেন, "সামূদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠালাম।"

হযরত সালিহ (আ) তাদের বললেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই।" হযরত সালিহ (আ)-এর আহ্বানে তারা কোনো সাড়াই দিল না বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করল। পরিশেষে তারা বলল, "হে সালিহ! তুমি যে নবী, তোমার কথা যে সত্য তার প্রমাণ কী? পারলে তুমি আমাদের মু'জিযা দেখাও।"

মু'জিযা মানে অলৌকিক ঘটনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী ধরনের মু'জিযা দেখতে চাও ?" সকলে একটি পাহাড় দেখিয়ে বলল, "এ পাহাড় থেকে এমন একটি উটনী বের কর যেটি বাচ্চা প্রসব করবে এবং দুধ দিবে।" হযরত সালিহ (আ) বললেন, "মু'জিযা আমি দেখাব, তবে একটি শর্ত আছে, আর তা হল তোমরা উটনীকে কোনোপ্রকার কষ্ট দিতে পারবে না। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠিন শাস্তি দিবেন।"

হযরত সালিহ (আ) আল্লাহর নিকট দুআ করলেন। মুহূর্তেই একটি বিকট শব্দ হল। আর অমনি বিশাল পাথর ফেটে গিয়ে একটি বিরাট উটনী বের হল এবং সাথে সাথে একটি বাচ্চাও প্রসব করল। প্রচুর পরিমাণে দুধও দেওয়া শুরু করল। সকলে চমকিত হল। সামূদ জাতির লোকেরা উটনীর দুধ পান করে সচ্ছলতার সাথে দিনযাপন করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই কতিপয় কাফির একত্রিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর নবী হযরত সালিহ (আ)-এর আদেশ অমান্য করে উটনীকে যবেহ্ করে।

হযরত সালিহ (আ) এ ঘটনায় ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তিনি কাফিরদের বললেন, "এ পাপের ফলে তিন দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসবে।" ঠিকই তিন দিন পর হযরত জিবরাঈল (আ) ঐ এলাকায় আসলেন এবং এমন জোরে চিৎকার দিলেন যে, কাফিররা সকলে নিজ নিজ স্থানে মরে পড়ে থাকল।
হযরত সালিহ (আ) এ ঘটনার পর সিরিয়ায় চলে যান এবং আল্লাহর দীন প্রচার করতে থাকেন। এরপর সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত সালিহ (আ)- এর জাতি আল্লাহর ও তাঁর নবীর নির্দেশের বিরোধিতার কারণে সমূলে ধ্বংস হয়েছিল।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)

জন্ম

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

আরবের অবস্থা

তাঁর জন্মের সময় আরবের লোকেরা ছিল নানা পাপে লিপ্ত। মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি করেই তৎকালের লোকদের জীবন চলত। এক আল্লাহ-কে ভুলে তারা নানা দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করত। পবিত্র কা'বা শরীফ তারা মূর্তিতে ভরে রেখেছিল। বাজারে পণ্যের মতো মানুষ বেচাকেনা হত। মনিবরা দাস-দাসীদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করত। নারীদের কোনো মানসম্মান বা অধিকার ছিল না। এমনকি সেসময় মেয়েশিশুদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হত।

এরূপ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠান। তাঁর আগেও অনেক নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন। আমাদের নবীই হলেন সর্বশেষ নবী। সকল নবীর সেরা নবী বিশ্বনবী।

বংশ-পরিচয়

তিনি মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মায়ের নাম আমিনা। জন্মের ছয় মাস পূর্বেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মাদ এবং আহ্‌মাদ।

লালনপালন

আরবের উচ্চবংশীয়দের তৎকালের প্রথা অনুযায়ী তাঁর লালনপালনের ভার পড়ে ধাত্রী হালিমার ওপর। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্নে শিশু মুহাম্মাদ (স)-কে লালনপালন করেন। এরপর মুহাম্মাদ (স) ফিরে আসেন মা আমিনার কোলে। মা আমিনা সীমাহীন আদর-সোহাগে পুত্রকে কোলে তুলে নেন।

কিন্তু তাঁর কপালে এ আদর বেশিদিন রইল না। তাঁর মাও ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। এবার তিনি পিতামাতা দুইজনকেই হারিয়ে ইয়াতীমে পরিণত হন। উম্মে আয়মন নামক একজন পরিচারিকা ইয়াতীম মুহাম্মাদ (স)-কে দাদা আব্দুল মুতালিবের হাতে তুলে দেন। দাদার আশ্রয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স) পালিত হতে থাকেন। কিছুদিন পর দাদাও তাঁকে ছেড়ে চলে যান পরপারে। এসময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র আট বছর। এবার তিনি চাচা আবূ তালিবের আশ্রয়ে বড় হতে থাকেন। চাচার সংসারে ছিল অভাব-অনটন। তিনি এসময় মেষ চরান, চাচার ব্যবসাকার্যে সহযোগিতাও করেন। এ সময় একবার চাচার সাথে ব্যবসা করতে তিনি সিরিয়াও গিয়েছিলেন। সিরিয়া ভ্রমণে তাঁর সাথে বহীরা নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রীর দেখা হয়।

বহীরা তাঁর চাচাকে ডেকে বলেন, বালকটিকে তিনি যেন সাবধানে রাখেন। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে পারে। এ বালকটি হবে শেষ যমানার নবী; সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল।

হযরত মুহাম্মাদ (স) তখন যুবক। ওকায মেলায় জুয়াখেলাকে কেন্দ্র করে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চলল একটানা পাঁচ বছর। অনেক মানুষ আহত নিহত হয়। মুহাম্মাদ (স) এ হিংসা হানাহানি, রক্তারক্তি দেখে ব্যথিত হলেন। কীভাবে শান্তি স্থাপন করা যায় তিনি ভাবতে লাগলেন।

অবশেষে শান্তিকামী কতিপয় যুবক নিয়ে তিনি ‘হিলফুল ফুযুল’ নামে একটি শান্তিসংঘ গঠন করলেন। এর দ্বারা তিনি গোত্রে গোত্রে শান্তি, সম্প্রীতি স্থাপন করলেন এবং মারামারি হানাহানি বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। ইতোমধ্যেই সত্যবাদী, পরোপকারী, শান্তিকামী যুবক হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আপন পর সকলে তাঁকে আল-আমীন (বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করল।

বহুদিন পূর্বের নির্মিত পুরাতন কা’বাগৃহ সংস্কারের কাজ হাতে নিল কুরাইশরা। যথারীতি কা’বাঘর পুনর্নির্মাণও করল তারা। কিন্তু পবিত্র ‘হাজরে আসওয়াদ’ বা কালো পাথর স্থাপন নিয়ে বিবাদ লেগে গেল। প্রত্যেক গোত্রেই এ পাথর কা’বার দেয়ালে স্থাপন করার সম্মান অর্জন করতে চাইল। যুদ্ধের সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল আগামী দিন প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সবার আগে কা’বাগৃহে আগমন করবে তার ওপরই বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হবে। সে যা সিদ্ধান্ত দিবে তা সকলে মেনে নিবে।

প্রত্যুষে দেখা গেল হযরত মুহাম্মাদ (স) কা’বায় প্রবেশ করছেন, অমনি সকলে চিৎকার দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে বলল: আল-আমীন আসছেন, সঠিক মীমাংসাই হবে।

হযরত মুহাম্মাদ (স) একখানা চাদর বিছিয়ে দিলেন। তারপর চাদরে নিজ হাতে পাথরখানি রাখলেন। সকল গোত্রের সরদারকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। এরপর যথাস্থানে তা তারা বহন করে নিয়ে গেল। হযরত মুহাম্মাদ (স) নিজের হাতে পাথরখানি কা'বার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। একটি অনিবার্য যুদ্ধ থেকে সকলে বেঁচে গেল। পাথর ওঠাবার সম্মান পেয়ে সকলে খুশিও হল।

খাদীজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ ও বিবাহ

তৎকালে আরবে একজন বিখ্যাত ধনী মহিলা ছিলেন, তাঁর নাম খাদীজা। তিনি তাঁর বিশাল বাণিজ্য দেখাশুনা করার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সুন্দর চরিত্রের সুনাম শুনে তিনি তাঁর ওপর ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) খাদীজার ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান। ব্যবসায় প্রচুর লাভ করে তিনি মক্কা ফিরে আসেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সততা, কর্মদক্ষতা দেখে খাদীজা মুগ্ধ হন। এরপর তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অভিভাবক তখন তাঁর চাচা আবূ তালিব। আবূ তালিব মুহাম্মাদ (স)-এর সঙ্গে হযরত খাদীজার বিবাহের সকল ব্যবস্থা করে দেন। শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হল। তখন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বয়স পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজা (রা)-এর চল্লিশ বছর।

নবুওয়্যাত লাভ

হযরত মুহাম্মাদ (স) শিশুবয়স থেকে মানুষের মুক্তি এবং শান্তির জন্য ভাবতেন। যুবকবয়সে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হয়। খাদীজার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তাঁর ধ্যান-সাধনা আরো বৃদ্ধি পায়। মূর্তি পূজায় লিপ্ত এবং নানা দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত মানুষের মুক্তির জন্যই তাঁর সব ভাবনা। মানুষ তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে থাকবে, এটা হয় না। কী করা যায়, কীভাবে মানুষের হৃদয়ে এক আল্লাহর ভাবনা জাগানো যায়, শির্‌ক ও কুফ্‌র থেকে তাদের মুক্ত করা যায় এ সকল বিষয়ের চিন্তা-ভাবনায় তিনি মগ্ন। বাড়ি থেকে বেশ দূরে হেরা গুহায় গিয়ে নির্জনে এ বিষয়ে ধ্যান করতেন। কখনো কখনো একাধারে দুই-তিন দিনও সেখানে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এভাবে দীর্ঘদিন ধ্যান করার পর অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি নবুওয়্যাতপ্রাপ্ত হন।

আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্ম থেকে নবুওয়্যাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবন আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, তিনি ছিলেন সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলেননি, কাউকে গালি দেননি, কারো সাথে প্রতারণা করেননি, ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। তিনি ছিলেন মানুষের কল্যাণকামী, শত্রুও তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। আমরা তাঁর জীবন-আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত আবূ বক্‌র (রা)

পরিচয়

আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রা)। মক্কার কুরাইশ বংশের তায়ম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবূ কুহাফা উসমান আর মাতার নাম উম্মুল খায়র সালমা। তাঁর পিতামাতা উভয়ই মহানবী (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শিশুবয়স হতেই তিনি কোমল ও সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত। শিক্ষা শেষ করে তিনি গোত্রীয় পেশা ব্যবসা শুরু করেন। মহানবী (স)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় তাঁর সাথে হযরত আবূ বক্‌র (রা)-এর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মহানবী (সা) তখনও নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হননি, তবুও তিনি যা বলতেন হযরত আবূ বক্‌র (রা) সবই বিশ্বাস করতেন।

হযরত আবূ বক্‌র (রা) একবার ইয়ামানে বাণিজ্যে গেলেন । মক্কা ফিরে শুনলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়্যাত লাভ করেছেন, তিনি একত্ববাদের ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেছেন। সব শুনে আবূ বক্‌র (রা) সোজা নবী কারীম (স)-এর কাছে হাজির হলেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম প্রচার করার কারণে মক্কার লোকেরা নবী কারীম (স)-এর সঙ্গে শত্রুতা শুরু করল। হযরত আবূ বক্‌র (রা) এ অবস্থায় সবসময় মহানবী (স)-এর সঙ্গে থাকতেন। নবী কারীম (স) যখন যুদ্ধে যেতেন তখন নবী কারীম (স)-এর পাশে থেকে হযরত আবূ বক্‌র (রা) কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। নবী কারীম (স)-কে মক্কায় কাফিররা হত্যা করতে চাইলে তিনি হযরত আবূ বক্‌র (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা হিজরত করেছিলেন।

ইসলামের সেবা

হযরত আবূ বক্‌র (রা) ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হযরত উসমান, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত আব্দুর রহমান, হযরত সাদ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ বড় বড় সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম দাসদাসীদেরকে তাদের কাফির মুনিবরা কঠিন শাস্তি দিত, নির্যাতন করত। হযরত আবূ বক্‌র (রা) এসব দেখে মনে কস্ট পেতেন। তাই নিজের অর্থে এদের কিনে মুক্ত করে দিতেন। এভাবে হযরত বিলাল (রা)-সহ অনেককে তিনি কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তাবুক যুদ্ধের সময়ে হযরত আবূ বক্‌র (রা) তাঁর সকল ধনসম্পদ নিয়ে নবী কারীম (স)-এর সামনে হাজির হলেন। নবী কারীম (স) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ঘরে কী রেখে আসলে?" তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।"

খলীফা নির্বাচন

মহানবী (স)-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম-সাম্রাজ্যের খলীফা নির্বাচিত হন হযরত আবূ বক্‌র (রা)। এ সময় মুসলিম সাম্রাজ্যে কতগুলো সমস্যা দেখা দেয়। কিছুলোক নবী হওয়ার মিথ্যা দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবূ বক্‌র (রা) কঠোরভাবে সব বিশৃঙ্খলা দমন করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। নবী কারীম (স)-এর আদর্শমতো দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর শাসনকালে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামার যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে অনেক হাফিয সাহাবী শহীদ হন। এরপর কুরআন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে হযরত আবূ বক্‌র (রা) কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন। সে সময় আমাদের যুগের মতো কাগজ ছিল না। ছাপাখানা ছিল না। তাই সাহাবীগণ গাছের বাকলে, হাড়ে, চামড়ায় লিখে রেখেছিলেন কুরআনের আয়াত। হযরত আবূ বক্‌র (রা) সব একত্র করে একটি কপি করলেন এবং মহানবী (স)-এর স্ত্রী বিবি হাফসা (রা)-এর নিকট তা গচ্ছিত রাখলেন। ইসলামের এসব মহৎ কর্মের জন্য তাঁকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

চরিত্র

হযরত আবূ বক্‌র (রা) ছিলেন সাদাসিধে মানুষ। জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তিনি জ্ঞানী ও গুণী দানশীল ছিলেন। মানুষের সেবা করতে তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। ইসলামের সেবায় হযরত আবূ বক্‌র (রা)-এর দান ছিল অতুলনীয়। তিনি ইসলামের জন্য তাঁর সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যই মহানবী (স) বলেছেন, "সামর্থ্য ও ধনসম্পদ দিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকার করেছে আবূ বক্‌র।" তিনি ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট ইন্তিকাল করেন।

হযরত আবূ বক্‌র (রা) ইসলামের সেবায়, দান-দাক্ষিণ্যে, চারিত্রিক দৃঢ়তায় সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে বর্তমান বিশ্ব নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। আমরা হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দিক (রা)-এর আদর্শ অনুসরণ করে চলব।

হযরত উমার ফারূক (রা)

পরিচয়

মহাবীর হযরত উমার ফারূক (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। সকলে তাঁকে আবূ হাফ্স নামে ডাকত। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম হানতাম। উমার বাল্যকালে শিক্ষা-দীক্ষায় সুনাম অর্জন করেন। বড় হয়ে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, নামকরা কুস্তিগীর, সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা।

ইসলাম গ্রহণ

মহানবী (স) যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বললেন তখন স্বার্থবাদী কুরাইশরা মহানবী (স)-এর ঘোরতর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। সে ঘোষণা শুনে উমার কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে নবী কারীম (স)-কে হত্যা করতে ছুটলেন। পথে ঘটল এক ঘটনা। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, উমার! তুমি কোথায় যাচ্ছ ? রাগত স্বরে জবাব দিলেন, মুহাম্মাদ (স)-কে হত্যা করতে। ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমার বোন, ভগ্নীপতি যেখানে মুসলমান হয়ে গেছে সেখানে তাদের কিছু বলতে পারছ না, অথচ মুহাম্মাদকে হত্যা করবে ? উমার (রা) অপমান বোধ করে আরও রেগে গেলেন। সোজা বোনের বাড়ি গেলেন। ঘরের বাইরে থেকে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনলেন। তিনি ঘরে ঢুকে বোন ও ভগ্নীপতিকে মারধোর শুরু করলেন।

তাঁর মারপিটে তাঁদের শরীর ফেটে রক্ত বের হতে দেখে উমারের হৃদয়ে মায়া জাগল। উমার (রা) বললেন, তোমরা কী পাঠ করতেছিলে ? উমারের বোন বললেন,আল্-কুরআন। উমার বললেন, আমাকে তা দেখাও। বোন বললেন, অপবিত্র শরীরে তা স্পর্শ করা যায় না। উমার পবিত্র হয়ে এলে তিনি তা তাঁকে দিলেন। উমার মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করে কেমন যেন হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী মুহাম্মাদ (স) কোথায় ? আমি মুসলমান হব। এরপর নবী কারীম (স)-এর কাছে গিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং কা'বার সামনে প্রকাশ্যে নামায আদায়ের সংকল্প ব্যক্ত করলেন। নবী খুশি হয়ে উমারকে উপাধি দিলেন 'ফারূক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী। মুসলমান হয়ে উমার (রা) ইসলামপ্রচার কার্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সর্বদা নবী কারীম (স)-এর সাথে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।

খলীফা নির্বাচন

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বক্র (রা) ইন্তিকাল করলে হযরত উমার (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্য অনেক বিস্তৃত হয়। রোম, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন জয়লাভ করে।

সুশাসন

আল্লাহর বাণী ও মহানবী (স)-এর আদর্শমতো হযরত উমার (রা) রাজ্যশাসন করতেন। আইনের চোখে সকলকে সমান দেখতেন। তিনি মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবূ শামাকেও কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে রাজ্যে কোনো অভাব ছিল না। তিনি গভীর রাতে মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। আইনের বেলায় তিনি যেমন ছিলেন কঠোর। আবার মানুষের দুঃখ-কষ্টে ছিলেন তেমনি কোমল।

এক রাতে তিনি ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্না শুনে নিজের কাঁধে আটার বস্তা বহন করে তাদের ঘরে দিয়ে আসেন এবং শিশুদের তৃপ্ত করে আহার করান। তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। জেরুজালেমে যাওয়ার পথে তিনি পালাক্রমে নিজের চাকরকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে পায়ে হেঁটে চলেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ ভীরু। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। তিনি হিজরি সন প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে কৃষিকাজে অনেক উন্নতি হয়েছিল।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

হযরত উমারের ভয়ে পৃথিবীর রাজা–বাদশাগণ সবসময় থাকতেন কম্পমান; অথচ তিনি নিজে গরিবের মতো সাদাসিধে চলাফিরা করতেন। কোনো দেহরক্ষীও তার ছিল না। সামান্য যা জুটত তাই আহার করে সারাদিন জনগণের খিদমত করতেন। জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি অসংখ্য মসজিদ, সেতু, হাসপাতাল, সড়ক, বিদ্যালয় নির্মাণ করেন এবং অনেক খাল খনন করেন। ইবাদাত বন্দেগি ও কুরআন তিলাওয়াতে তিনি অনেক সময় কাটাতেন।

শাহাদাত বরণ

একদিন ফজরের নামাযে ইমামতি করার সময় আবূ লুলু নামক এক ইয়াহূদী চর তরবারি দ্বারা তাঁকে আঘাত করে এবং এতেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ন্যায়বিচার, প্রজাবাৎসল্য, সুশাসন, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে হযরত উমার (রা) সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য আদর্শ। আজকের দুনিয়া তাঁর আদর্শ অনুসরণ করলে অনেক সমস্যার সুন্দর সামাধান হতে পারে।

আমরা তাঁর আদর্শ মেনে চলব এবং তাঁর মহান আদর্শে উজ্জীবিত হব।

হযরত উসমান (রা)

পরিচয়

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা ছিলেন হযরত উসমান (রা)। ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল গণী এবং যুননূরাইন। গণী অর্থ ধনী। তিনি তৎকালের আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ছিলেন বলে তাঁকে গণী বলা হত। যুননূরাইন অর্থ দুইটি নূরের অধিকারী। তিনি মহানবী (স)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে একজনের মৃত্যুর পর অন্যজনকে বিবাহ করেছিলেন বলে তাঁকে যুননূরাইন বলা হত। তাঁর পিতার নাম আফ্‌ফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ। শিশুকাল হতেই তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষায়ও ছিলেন সুপরিচিত। যৌবনে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করে অগাধ সম্পদের মালিক হন।

ইসলাম গ্রহণ

চৌত্রিশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ কারণে তাঁর চাচা হাকাম তাঁকে অনেক নির্যাতন করে। সব নির্যাতন সহ্য করেও তিনি ইসলামে অটল-অবিচল থাকেন।

ইসলামের সেবা

মহানবী (স) মদীনায় হিজরত করার পর মুসলমানদের পানির কষ্ট দেখে উসমান (রা) অনেক অর্থ ব্যয়ে রুমা নামে একটি কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করেন। মসজিদে নববী সম্প্রসারণের সময় এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করে দেন। উসমান (রা) মহানবী (স)-এর খিদমতে সর্বদা লেগে থাকতেন। হযরত আবূ বক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি তাঁদের পরামর্শদাতা ছিলেন। হযরত উমার (রা) শাহাদাত বরণ করার পর হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হন।

কুরআন সংকলন

তিনি একবার লক্ষ্য করেন যে, আরবের বিভিন্ন গোত্রে পবিত্র কুরআন বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করা হয়। এতে তিনি শঙ্কিত হন। এরপর হযরত আবূ বক্‌র (রা) কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি হযরত হাফ্‌সা (রা)-এর নিকট থেকে আনিয়ে এর অনেক কপি করান এবং মুসলিম-সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। এভাবে তিনি মুসলিমজাতির সংহতি রক্ষা করেন। এজন্য তিনি জামিউল-কুরআন (কুরআন-সংকলনকারী) হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

শাহাদাত

তাঁর খিলাফতের শেষদিকে ইসলামবিরোধীরা গভীর ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের মাঝে ঝগড়া-বিভেদ সৃষ্টি করে। ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যে অশান্তি দেখা দেয়। সরল প্রকৃতির মানুষ হযরত উসমান (রা) এসময় কতিপয় বিপথগামীর হাতে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কুরআন পাঠরত অবস্থায় নিজগৃহে শাহাদাত বরণ করেন।

> আমরা হযরত উসমান (রা)-এর দানশীলতা, উদারতা ও আল্লাহ নির্ভরশীলতার আদর্শে উজ্জীবিত হব।

হযরত আলী (রা)

পরিচয়

হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। তিনি ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। আবূ তালিব ছিলেন তাঁর পিতা। শিশু বয়স হতেই মহানবী (স)-এর সঙ্গে থাকতেন। হযরত আলী (রা) যখন দশ বছরের বালক তখন মহানবী (স) নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। হযরত আলী (রা) এ সময় ইসলাম গ্রহণ করে বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যখন মুসলমানগণ কাফিরদের নির্যাতনে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত আলী (রা) মহানবী (স)-এর সাথেই থেকে যান। কাফিররা মহানবী (স)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে মহানবী (স) আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন এবং মক্কাবাসীর গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দেওয়ার জন্য নিজের প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আলী (রা)-কে ঘরে রেখে যান। হযরত আলী (রা) নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহানবী (স)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

বীরত্ব

হযরত আলী (রা) ছিলেন শক্তিশালী সাহসী যোদ্ধা। তিনি মহানবী (স)-এর সঙ্গে থেকে অসীম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। খায়বার যুদ্ধের সময় ইয়াহূদীদের সুরক্ষিত কামূস দুর্গ কেউই যখন জয় করতে পারল না, তখন মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে পাঠালেন। হযরত আলী (রা) দুর্গের বিশাল লোহার দরজাটিকে এক ধাক্কায় হাতে তুলে নিলেন এবং ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে থাকলেন। ইয়াহূদীরা এই অবস্থা দেখে ভয়ে সকলে আত্মসমর্পণ করল। যুদ্ধের পর ঐ কপাটটি অনেক শক্তিশালী যুবকও তুলতে পারেনি। এ ঘটনায় মহানবী (স) হযরত আলী (রা)-কে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধি দান করেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে মহাবীর হযরত আলী (রা)-এর হাতেই মুসলিম বাহিনীর পতাকা শোভা পাচ্ছিল।

খলীফা নির্বাচন

৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উসমান (রা) শাহাদাত বরণ করলে হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। নানা সমস্যার মধ্যেও তিনি জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করতেন।

অনাড়ম্বর জীবনযাপন

শিশুবয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আলী (রা) অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। জাঁকজমক পছন্দ করতেন না। কঠোর পরিশ্রম করে আহার জোটাতেন। খেয়ে না-খেয়ে তিনি জীবন কাটাতেন। অহঙ্কার বলতে তাঁর মধ্যে কিছুই ছিল না। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও তিনি সংসারের কাজ নিজ হাতেই করতেন। বসবাস করতেন জীর্ণশীর্ণ একটি কুটিরে। তিনি ধনী-দরিদ্র সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। হযরত আলী (রা) ছিলেন সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে নামাযরত অবস্থায় এক ইয়াহূদী আততায়ীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

> আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে বীরত্ব, নিরহঙ্কার ও সহজ সরল জীবনযাপনের আদর্শ গ্রহণ করব।

হযরত খাদীজা (রা)

পরিচয়

বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন পুণ্যবতী নারী প্রসিদ্ধ তাঁদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা) অন্যতম। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশেই তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন খুওয়াইলিদ ইব্‌ন আসাদ। হযরত খাদীজা (রা)-এর উপাধি ছিল তাহিরা বা পুণ্যবতী। তিনি ছিলেন শিক্ষিতা ও সম্পদশালিনী। সমগ্র আরব জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল।

মহানবী (স)-এর সুন্দর চরিত্র ও মানবসেবার সুনাম সম্পর্কে অবগত হয়ে হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে তার ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। মহানবী (স) তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে সিরিয়া যান এবং সততা ও দক্ষতার সাথে ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করে ফিরে আসেন।

বিবাহ

মহাবনী (স)-এর সততা ও দক্ষতা দেখে হযরত খাদীজা (রা) তাঁর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। চাচা আবূ তালিবের সম্মতিক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হয়। মহানবী (স)-এর বয়স তখন পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজা (রা)-এর বয়স চল্লিশ বছর। বিবাহের পর হযরত খাদীজা (রা) প্রিয় নবী (স)-কে তাঁর সকল সম্পদ দান করে দেন এবং মহানবী (স)-এর খিদমতে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

ইসলাম গ্রহণ

হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হয়ে নবীজী ভীত হয়ে পড়েন। হযরত খাদীজার কাছে বললেন, "আমাকে বস্ত্রে আবৃত কর। আমার ভয় হচ্ছে।" হযরত খাদীজা (রা) সব শুনে নবী কারীম (স)-কে সান্ত্বনা দিলেন। সেবা-শুশ্রূষা করলেন আর বললেন, "আল্লাহ আপনাকে অপদস্ত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, দুস্থ অভাবীদের সাহায্য করেন।" এরপর হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ ওয়ারাকার নিকট নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা সব শুনে বললেন, "এতে ভয়ের কিছু নেই। হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা তাঁর কাছে ওহী নিয়ে এসেছেন।" নবী কারীম (স) আল্লাহর নির্দেশে ইসলাম প্রচার শুরু করলে সর্বপ্রথম মুসলমান হন হযরত খাদীজা (রা)। তিনি ইসলাম প্রচারে নবীজীকে সর্বপ্রকারের সহযোগিতা করতে থাকেন। মক্কার লোকেরা যখন নবীজীর শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তখন হযরত খাদীজা সর্বদা নবী কারীম (স)-এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দিতেন। দীন প্রচারে উৎসাহ দিতেন। মহানবী (স)-এর মানমর্যাদা ও সম্মানের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর ছিল অগাধ স্বামীভক্তি।

শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে মহানবী (স) বলেছেন, বিশ্বের সকল নারীর উপর চারজনের সম্মান রয়েছে– হযরত মারইয়াম, হযরত খাদীজা, হযরত ফাতিমা, হযরত আসিয়া। হযরত খাদীজা (রা) নবুওয়্যাতের দশম বর্ষে রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে মহানবী (স) মর্মাহত হন।

সুন্দর চরিত্র, স্বামীভক্তি, ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার হযরত খাদীজা (রা)-কে বিশ্বনারীদের ইতিহাসে মহীয়সী করে রেখেছে।

আমরা হযরত খাদীজা (রা)-এর অনুপম চরিত্র ও মহান ত্যাগের আদর্শ অনুসরণ করব।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর আসল নাম নুমান। তাঁর পিতার নাম সাবিত। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আল্লাহ ভীরু ব্যবসায়ী। হিজরি ৮০ সনে কূফায় তাঁর জন্ম হয়। অসাধারণ মেধা দেখে তাঁর পিতা সন্তানের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআনে হাফিয হন। এরপর তাফসীর, হাদীস, আরবি ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তৎকালের জগৎ-বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীদের নিকট ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন।

তিনি পবিত্র কুরআন-হাদীস সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে মুসলমানদের জন্য একটি আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, যা ফিক্‌হ শাস্ত্র নামে পরিচিত। এ শাস্ত্রে নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এটা ছিল তাঁর এক মহৎ উদ্যোগ। এ উদ্যোগ সফল করার জন্য বড় বড় আলিমদের নিয়ে তাঁর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি দীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফিক্‌হ শাস্ত্র সংকলন করেন। এ না হলে সাধারণ মানুষ ইসলামের বিধান পালন করতে অসুবিধায় পড়ত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি ধন-সম্পদ ও রাষ্ট্রীয় পদের মোহ ত্যাগ করেছিলেন। তৎকালীন খলীফা কর্তৃক প্রধান কাযীর লোভনীয় পদও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তিনি ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর আবিদ, আল্লাহ ভীরু। তাঁর চরিত্র ছিল সুন্দর। কথায়, কাজে তিনি মানুষের মন জয় করতে পারতেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আব্বাসীয় খলীফা মানসুরের জেলখানায় এ মহামনীষী ১৫০ হিজরিতে শাহাদাত বরণ করেন।

আমরা তাঁর সম্বন্ধে আরও জানার চেষ্টা করব। ইমাম আবূ হানীফা (র) জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় যে আদর্শ রেখে গেছেন তা আমরা অনুসরণ করব।

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) ৪৭০ হিজরি সনে রমযান মাসে ইরানের জিলান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল গাওসুল আযম, মুহিউদ্দিন, কুতুবে রাব্বানী ইত্যাদি। তাঁর পিতার নাম আবূ সালেহ মূসা, আর মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। পিতৃমাতৃ উভয় কুলে তিনি মহানবী (স)-এর বংশধর ছিলেন। শিশুবয়স হতেই তিনি শান্ত,ভদ্র, চিন্তাশীল, শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা। তিনি শিশুবয়সেই পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন। জিলানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদ গমনকালে তাঁর মাতা তাঁকে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা জামার আস্তিনে সেলাই করে দেন এবং কখনও মিথ্যা না-বলার উপদেশ দেন। বাগদাদ যাওয়ার পথে তাঁর কাফিলা হামাদান নামক স্থানে ডাকাত কবলিত হয়। ডাকাতরা যাত্রীদের সবকিছু লুটে নেয়। ডাকাতরা তাঁর নিকট কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। লুকানো মুদ্রা দেখে ডাকাতরা বলল, তুমি তো স্বীকার না করলেও পারতে। তিনি বললেন, মা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন,তাই আমি সত্য বলেছি। ডাকাতদল তাঁর সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গেল।

বাগদাদে তিনি বিখ্যাত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাগদাদে শিক্ষা গ্রহণকালে তিনি অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করেন। মায়ের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা শেষ হয়ে গেলে তিনি খেয়ে না-খেয়ে, কখনও গাছের পাতা খেয়ে জীবনধারণ করেন। তবুও লেখাপড়া ত্যাগ করেননি।

শিক্ষা শেষে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বড় বড় আলিম ও শিক্ষার্থীরা তাঁর নিকট জ্ঞান লাভ করতে আসতেন। একদিকে তিনি যেমন শিক্ষকতা করতেন অন্যদিকে তেমনি ওয়ায নসিহত করতেন। তাঁর

ওয়ায মাহফিলে অসংখ্য লোক সমাগত হত। ওয়ায শুনে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতেন আর মুসলমানগণ খাঁটি মুসলমান হতেন। সারাদিন শিক্ষাদান, ওয়ায-নসিহত এবং সারারাত ইবাদাতে কাটাতেন। শুক্রবার প্রাতে ও সোমবার সন্ধ্যায় তিনি তাঁর মাদ্‌রাসাতে ওয়ায করতেন, রবিবার প্রাতে করতেন তাঁর খানকায়। তিনি অত্যন্ত মানবদরদী ছিলেন। গরিব-দুঃখীদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন, অভাবী দুস্থদের সাহায্য করতেন। বাগদাদে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি তাঁর হাতখরচের অর্থ দ্বারা দুস্থদের সাহায্য করেন এবং নিজে অর্ধাহারে–অনাহারে দিন কাটান। তিনি অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। ঝাঁকজমক পছন্দ করতেন না। তাঁর মতো এতবড় ওলী পৃথিবীতে বিরল। তাই তাঁকে গাউসুল আযম বা বড়পীর বলা হয়। হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরি সনের ১১ই রবিউস সানি ইন্তিকাল করেন।

আমরা হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র)-এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ে তুলব। সদা সত্যকথা বলব, শিক্ষা গ্রহণে ত্যাগ স্বীকার করব, দুস্থদের সেবা করব।

হযরত শাহ্ জালাল (র)

বিশ্ববিখ্যাত ওলী হযরত শাহ জালাল (র) ৫৯৫ হিজরি মোতাবেক ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মাদ। শৈশবে তিনি পিতামাতা হারান। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে লালিতপালিত হন। অল্প বয়সেই তিনি কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হসহ ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর আধ্যাত্মিক সাধনায় উচ্চস্থান লাভ করেন।

তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন। দিল্লি থেকে ৭০৩ হিজরি মোতাবেক ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিলেটে আসেন। সিলেটে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর হাতে এ অঞ্চলের বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত শাহজালাল (র)-এর ব্যাপারে ইতিহাসে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সিলেট অঞ্চলে তখন গৌরগোবিন্দ নামে এক অত্যাচারী হিন্দু রাজা ছিল। সে মুসলমান প্রজাদের অমানুষিক নির্যাতন করত। মুসলমানদের গরু যবেহ করা নিষিদ্ধ ছিল। কেউ গরু যবেহ করলে তার আর রক্ষা ছিল না। সেখানে বুরহানুদ্দীন নামক একজন দীনদার মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর পুত্রসন্তানের আকীকা উপলক্ষে গোপনে একটি গরু যবেহ করেছিলেন। একটি চিল এক টুকরো গোশত নিয়ে গৌরগোবিন্দের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ফেলেছিল।

গৌরগোবিন্দ গরুর মাংস দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হল এবং গুপ্তচর দ্বারা গরুর যবেহকারী বুরহানুদ্দীনকে ধরিয়ে আনল। শাস্তিস্বরূপ তাঁর হাত কেটে দিল এবং মায়ের কোল থেকে ফুটফুটে শিশুটিকে নিয়ে হত্যা করল। বুরহানুদ্দীন অনেক ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করেও পুত্রের জীবন রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি দিল্লি গমন করে সম্রাট ফিরোজ শাহের নিকট এ অমানুষিক নির্যাতনের বিচার প্রার্থনা করলেন। সব শুনে বাদশাহ সিকান্দার গাজীকে সৈন্যসহ গৌররাজ্য জয়ের জন্য পাঠালেন। কিন্তু গৌরগোবিন্দের নিকট তিন তিনবার পরাজিত হয়ে সৈন্যদল যখন দিল্লি ফিরে যাচ্ছিল, তখন পথে শাহজালাল (র)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। হযরত শাহজালালের অনুপ্রেরণায় তাঁরা গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পুনরায় অগ্রসর হন। গৌরগোবিন্দ এবার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হল না। অবশেষে গৌরগোবিন্দ তার লোকজন নিয়ে পালিয়ে গেল।

সিলেট মুসলমানদের হাতে এসে গেল। সিকান্দার শাহকে শাসক বানিয়ে হযরত শাহজালাল (রা) নিজে অনুসারীসহ ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হলেন। তিনি নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদাতে কাটাতেন। গরিব-দুঃখীদের তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর ও তাঁর সাথিদের প্রচেষ্টায় বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল এবং মুসলমানগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সমগ্র জীবনই তিনি ইসলামের

খিদমতে ব্যয় করেন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে অদ্যাবধি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। ৭৪৫ হিজরি মোতাবেক ১৩৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৫০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মাযার সিলেটে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত শাহজালাল (র) ছিলেন জগৎ-বিখ্যাত ওলী, মর্দে মুজাহিদ। আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চরম ত্যাগ ও সাধনার আদর্শ গ্রহণ করব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হযরত উমার ফারুক (রা) সর্বদা নবী কারীম (স)-এর সাথে থেকে—

ক. কাব্যচর্চা করতেন
খ. ইসলাম প্রচার করতেন
গ. বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতেন
ঘ. কুরআন অধ্যয়ন করতেন

২। হিজরি সন প্রবর্তন করেন—

ক. হযরত উমার ফারূক (রা)
খ. হযরত আবূ বকর (রা)
গ. হযরত উসমান (রা)
ঘ. হযরত আলী (রা)

৩। খাদীজা (রা) হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্ব দেন। কারণ—

ক. তাঁর উত্তম চরিত্রের জন্য
খ. তাঁর ব্যবসায়িক দক্ষতার জন্য
গ. তাঁর সরলতা ও দায়িত্ববোধের জন্য
ঘ. তিনি বেকার থাকার জন্য

৪। সর্বপ্রথম নবী ছিলেন—

ক. হযরত ইউনুস (আ)
খ. হযরত জাকারিয়া (আ)
গ. হযরত নূহ (আ)
ঘ. হযরত আদম (আ)

৫। ফিক্‌হ শাস্ত্র বলতে বুঝায়—

ক. কুরআন ও হাদীসের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ
খ. কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রণীত আইনশাস্ত্র
গ. ইসলামের বিধান সংক্রান্ত যেকোনো গ্রন্থ
ঘ. ইসলামের দৃষ্টিতে লিখা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আবদুল করিম সীরাত গ্রন্থ পড়ে জানতে পারে যে, হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ কাজে তাঁরা অনেক ধৈর্য ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। এ অভিজ্ঞতার আলোকে আবদুল করিম তার বন্ধুদেরকে নামায পড়ার দাওয়াত দিয়ে ব্যর্থ হয় এবং ধৈর্য হারিয়ে ফেলে।

৬। সর্বশেষ নবী—

ক. হযরত নূহ (আ)
খ. হযরত মুহাম্মাদ (স)
গ. হযরত আদম (আ)
ঘ. হযরত সালিহ (আ)

৭। আবদুল করিম দাওয়াতি কাজে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য নিচের কোন্ নবীর দাওয়াতি কাজ থেকে অধিক শিক্ষা নিতে পারে?

ক. হযরত লুত (আ) খ. হযরত আদম (আ)
গ. হযরত সালিহ (আ) ঘ. হযরত নূহ (আ)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। তাঁকে বলা হয় ইসলামের ত্রাণকর্তা। হযরত উমার (রা) ছিলেন দ্বিতীয় খলিফা। তিনি অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁকে ফারূক উপাধি প্রদান করেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি রাতের আঁধারে প্রজাদের সুখ-দুঃখ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। তিনি ছিলেন আইনের শাসক এবং সাম্য ও মানবতাবোধের এক মহান আদর্শ।

ক. ফারূক অর্থ কী?
খ. হযরত আবূ বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ. একজন রাষ্ট্রনায়ক, হযরত উমার (রা)-এর আদর্শ থেকে কী শিক্ষা লাভ করতে পারে আলোচনা কর।
ঘ. হযরত উমার (রা) অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

২। হযরত নূহ (আ) আল্লাহর একজন নবী। তিনি দীর্ঘকাল মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া অধিকাংশ লোকই ঈমান আনেনি। তাঁরা চরমভাবে তাঁর উপর অত্যাচার করেছিল এবং তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। তবুও তিনি ধৈর্যের সাথে তাঁর দাওয়াতি কাজ চালিয়ে গেছেন। অবশেষে তাঁর দু'আয় আল্লাহ মহাপ্লাবন দেন এবং ঈমানদারগণ ব্যতীত সকলে তাতে ডুবে মারা যায়।

ক. হযরত নূহ (আ) কত বছর মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন?
খ. হযরত নূহ (আ)-এর জাতি কেন মহাপ্লাবনে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।
গ. হযরত নূহ (আ)-এর দাওয়াত ও তাঁর জাতির পরিণতি থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?
ঘ. হযরত নূহ (আ)-কে আদমে সানী বা দ্বিতীয় আদম বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৩। রাশেদ ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তার মহল্লায় চুরি, ছিনতাই, মারামারি, গণ্ডগোল ইত্যাদি ঘটনা অহরহ ঘটছে। এসব সমস্যা দূর করার জন্য মহল্লায় বেশকিছু তরুণ মিলে রাসূল (স)-এর হিলফুল ফুযুল সংগঠনের অনুকরণে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে। রাশেদ সেই সংগঠনের একজন কর্মী।

ক. হিলফুল ফুযুল কী?
খ. রাশেদ ও তরুণরা মিলে কেন সংগঠন গড়ে তুলেছে?
গ. রাশেদ সংগঠনের কর্মী হওয়ার ফলে সে কীভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাচ্ছে—ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের ক্ষেত্রে হিলফুল ফুযুল-এর মতো সংগঠনের প্রয়োজন—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

১. **আকাইদ** : আকাইদ সম্বন্ধীয় পাঠদানে শিক্ষার্থীর পরিচিত পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে সহজ উদাহরণের সাহায্যে সহজ ও যুক্তিসহ আলোচনা, সুচিন্তিত কার্যক্রম অনুসারে প্রকৃতি পর্যালোচনা, প্রশ্নাবলি আহ্বান ও এগুলো সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদান করবেন।

২. **ইবাদাত** : নামায ও নামাযের প্রস্তুতিমূলক তাহারাত হাতে-কলমে শিক্ষাদান, শিক্ষক এগুলো প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করবে। সাওম, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতসমূহেও জায়েয চিত্র ও কাহিনী উল্লেখের মাধ্যমে আলোচনা ও আকর্ষণীয় করবেন।

৩. **আখলাক** : যুক্তিসহ আলোচনা, মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরবেন। প্রশ্নোত্তরে মানবিক দোষগুণের পর্যালোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে ও প্রশ্ন করবে।

৪. **কুরআন শিক্ষা** : কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য মাশক (অনুশীলন), তাজবীদের সাথে কুরআন তিলাওয়াত, সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী উপযুক্ত ও প্রসিদ্ধ ক্বারীর তিলাওয়াত শোনার আয়োজন করবেন; সম্ভব হলে টেপ-রেকর্ড ইত্যাদির ব্যবহার করবেন।

৫. জীবনচরিত : বর্ণনাকে সরল করার উদ্দেশ্যে আদর্শ কাহিনীর অবতারণা করে আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন।

মূল্যায়ন

১. বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা, শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা, বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ ও উদাহরণের মাধ্যমে বিভিন্নতা পৃথকীকরণ, বহুবিধ উত্তর থেকে সঠিক উত্তর খুঁজে বের করা, সঠিক তথ্য দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে হবে।

২. আর্থ-সামাজিক ও জনসেবামূলক কর্মসূচির দ্বারা শিক্ষার্থীর মনমানসিকতা, তৎপরতা ও দক্ষতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে শ্রেণীকক্ষে, খেলার মাঠে, মসজিদে, ঈদের জামাআতে, মাতাপিতা, ভাইবোন, সহপাঠী ও প্রতিবেশীদের সাথে আচার-ব্যবহারে, সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আন্তরিকতার সাথে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিতে হবে।

৩. প্রচলিত পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতিকে পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ ও তার দৈনন্দিন, মাসিক এবং বার্ষিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সার্বিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

পর্যবেক্ষণ ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

ক. ইসলাম-শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করা।

খ. ইসলামের বিষয়বস্তু অনুধাবনের পরিধি যাচাই করা।

গ. শ্রেণীকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়ের মৌলিক দিকগুলো আয়ত্তকরণ পর্যালোচনা করা।

ঘ. প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়ের ওপর সম্ভব হলে সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক আলোচনা সভায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যাচাই করা।

ঙ. ইবাদাত করার প্রবণতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে কিনা তা যাচাই করা।

চ. নিজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলাম-শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ও রেকর্ড মূল্যায়ন করা।

ছ. মসজিদ, নামায-ঘর, মক্তব, লাইব্রেরি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও দায়িত্ব পালনের রেকর্ড মূল্যায়ন করা।

জ. কুরআন মাজীদ, হাদীস শরীফ ও ইসলামী বই এবং পত্র-পত্রিকা পাঠের সম্বন্ধে ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

ঝ. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে ইসলামী বিধানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব সম্পর্কে অর্জিত ধারণা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করা।

নিচে কয়েকটি ব্যবহারিক কাজের নাম উল্লেখ করা হল।

১. ইমানের ৭টি মূল বিষয়ের নাম লেখা।

২. ১০ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা।

৩. আখিরাতের পর্যায়গুলো বর্ণনা করা।

৪. পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো ১টি রুকূ নাযিরা পাঠ করা।

৫. পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো ১টি সূরা মুখস্থ বলা।

৬. শরীআতের পরিভাষাগুলোর নামের তালিকা প্রস্তুত করা।

৭. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও রাকাআত সংখ্যার তালিকা তৈরি করা।

৮. সঠিক পদ্ধতিতে ওযূ করতে পারা।

৯. সঠিকভাবে ২, ৩, ও ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামায আদায় করতে পারা।

১০. নামাযে ব্যবহৃত দুআ কালাম মুখস্থ বলতে পারা।

১১. নামাযে ব্যবহৃত দুআ কালামের অর্থ ও মর্ম বলতে পারা।

১২. কোন্ কোন্ জিনিসের যাকাত দিতে হয় তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা।

১৩. আমরা কীভাবে পিতামাতার সাথে ভালো আচরণ করতে পারি–তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

১৪. আত্মীয়-স্বজনের একটি তালিকা প্রণয়ন করা।

১৫ প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের করণীয় কাজের একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

১৬. অসহায়-দরিদ্রদের যে যে উপায়ে সাহায্য করা যায় তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা।

১৭. সদাচরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

১৮. আমরা কী কী উপায়ে দেশের সেবা করতে পারি, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

১৯. হালাল উপার্জনের উপায়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করা।

২০. কী কী গুণ দেখে বন্ধু নির্বাচন করতে হবে, এর একটি তালিকা তৈরি করা।

২১. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার একটি পরিকল্পনা তৈরি করা।

২২. যে যে কাজে সমাজে ফিত্‌না-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয় তার একটি বিবরণ তুলে ধরা।

২৩. ধূমপানের ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করা।

২৪. মাদকাসক্তির কুফলের একটি তালিকা তৈরি করা।

২৫. মহানবী (স)-এর শিক্ষা ও আদর্শের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করা।

২৬. সময়কাল উল্লেখসহ (খিলাফত), খুলাফা-ই-রাশিদীন এর নাম ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা।

২৭. দীন প্রচার শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা ও মানবকল্যাণে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ১০ জন মুসলিম মনীষীর নাম লেখা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন ছক

পোশাক পরিচ্ছদ	আচার-আচরণ	শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি	ধর্মীয়/সামাজিক কর্মকাণ্ড	অভিভাবক/শিক্ষকের অভিমত	সামগ্রিক মূল্যায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬

সমাপ্ত